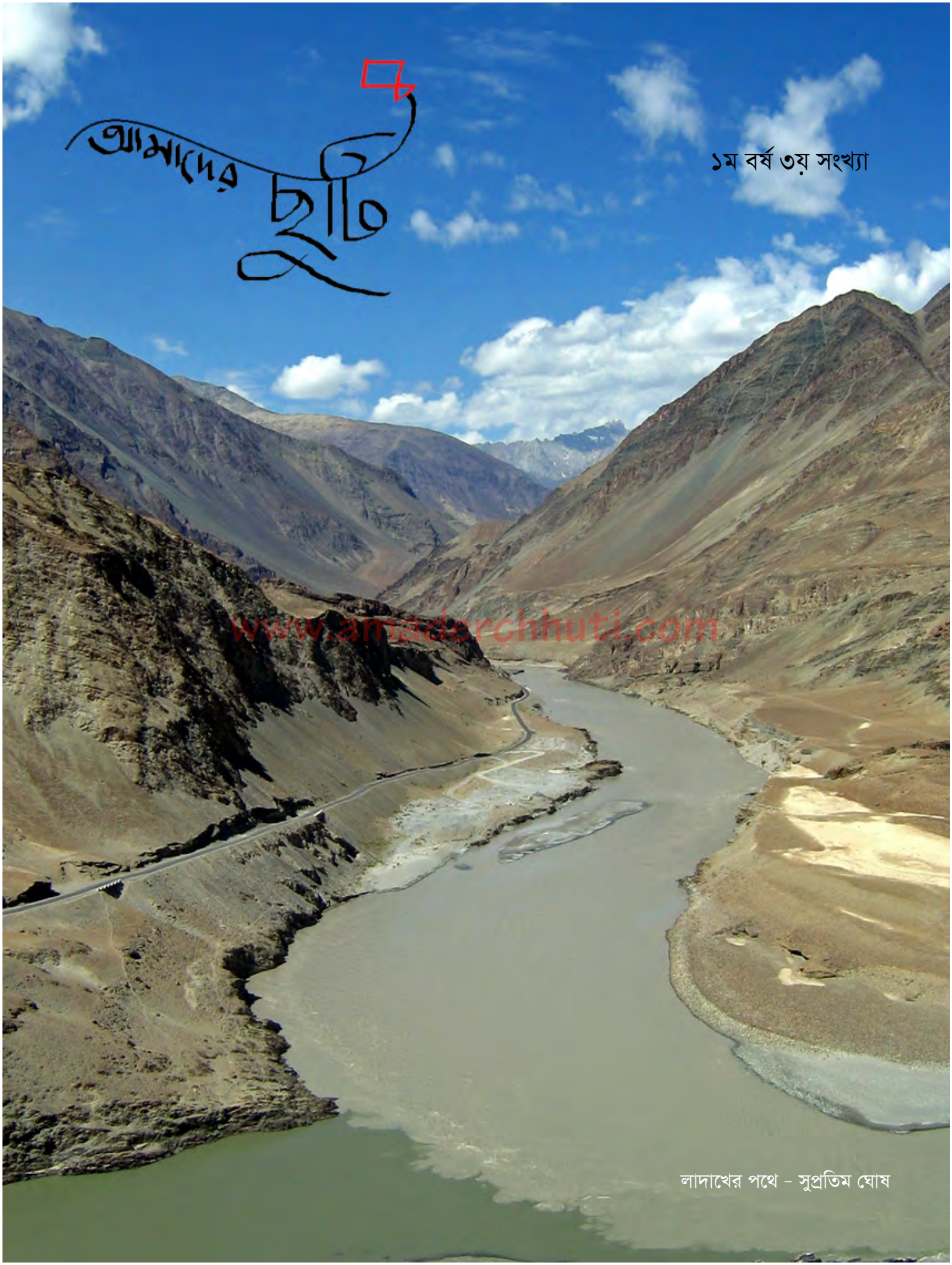
আমাদের ছুটি
১ম বর্ষ ৩য় সংখ্যা
www.amaderchhuti.com
লাদাখের পথে - সুপ্রতিম ঘোষ

☐ ১ম বর্ষ ৩য় সংখ্যা - পৌষ-মাঘ ১৪১৮☐

ভালোমন্দে কেটে গেল আরও একটা ইংরেজি বছর। বেশ কিছু মনে রাখার মতো মুহূর্তের পাশাপাশি মনখারাপ করা নানা ঘটনাবলি, একের পর এক মৃত্যুমিছিল নাড়িয়ে দিয়ে গেল আমাদের। তবু জীবন মানেইতো এগিয়ে চলা – চরৈবতি। ২০১১ সালটা 'আমাদের ছুটি-'র কাছে একটা বিশেষ বছর, আমরা যারা সাক্ষী ছিলাম বাংলা ভাষায় প্রথম ই-ভ্রমণ পত্রিকাটির জন্মমুহূর্তে, যারা একে তিল তিল করে বড় করছি,বড় হতে দেখছি – তাদের সবার কাছেও। আর তাই কাছে-দূরে বেড়ানোর কথা আর ছবি নিয়ে নতুন বছরের গন্ধ মেখে আবারও হাজির 'আমাদের ছুটি'। এই সংখ্যাটি প্রকাশিত হচ্ছে সম্পূর্ণ একটি নতুন আঙিনায় – ১ম কলকাতা ওয়েব উৎসবের প্রাঙ্গণে। সময়ের সাথে সাথে ভাবপ্রকাশের মাধ্যম হয়তো বদলে যাচ্ছে, কিন্ত মানুষের আবেগ সেই একইরকম-ই রয়েছে। উন্নততর টেকনোলজির যুগে কী-বোর্ড, মাউস আর টাচ-স্ক্রীন আজ চিন্তাপ্রকাশের হাতিয়ার, যার মাধ্যমে পেরিয়ে যাওয়া যায় দেশকালের সীমানার বেড়া। প্রথাগত সঞ্চারমাধ্যমের সাহায্য না নিয়েও বার্তা পৌঁছে দেওয়া যায় পৃথিবীর নানান প্রান্তে ছড়িয়ে থাকা মানুষের কাছে, মুহূর্তের মধ্যে খুঁজে নেওয়া যায় প্রয়োজনীয় তথ্য। নবীন এই মাধ্যমটি নিয়ে যাঁরা তৈরি করতে চাইছেন পত্রিকা তথা মিডিয়ার একটা অন্যরকম সংজ্ঞা, তাঁদের এক মঞ্চে নিয়ে আসার এই প্রচেষ্টার জন্য সাধুবাদ জানাই উৎসবের আয়োজক 'আসমানিয়া' ওয়েব পত্রিকাকে।

www.amaderchhuti.com

২০১২ আপনাদের সকলের ভালো কাটুক। নতুন নতুন জায়গায় বেড়াতে যান আর ফিরে এসে লেখায় -ছবিতে ভরিয়ে তুলুন আমার-আপনার প্রিয় 'আমাদের ছুটি'-কে।

- দময়ন্তী দাশগুপ্ত

- এই সংখ্যায় -

কথোপকথন

*"প্রথম সংখ্যা পনের দিনের মধ্যেই ফুরিয়ে গেল আর দেখলাম মোষ তাড়াতে বেশ মজাই পাচ্ছি" - বাংলাভাষায় প্রথম পূর্ণাঙ্গ ভ্রমণ পত্রিকা **'ভ্রমণ বার্তা'**-র চল্লিশ বছরের পথ হাঁটার স্মৃতিকথনে সম্পাদক প্রমোদাদিত্য মল্লিক*

☐ আরশিনগর ☐

ইতিহাসও কথা বলে

*আঠেরশো শতকের মুর্শিদাবাদ নগরীর প্রতিষ্ঠাতা মুর্শিদকুলি খাঁ-র সমাধি থেকে পায়ে পায়ে চলা শুরু... শীতের কুয়াশার মায়াজালে ঢাকা ইতিহাসের পদচিহ্ন ধরে পৌঁছানো হাজারদুয়ারিতে... দিনান্তের ক্যানভাসে বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজদৌল্লার সমাধির পশ্চাৎপটে এক অপরূপ সূর্যাস্ত দেখা - **দেবাশিস মজুমদারের** সঙ্গে।*

সব পেয়েছির দেশ

হিম মরুর নীল অতলে

*পূর্বদিকে তিব্বত আর পশ্চিমে জাঁসকার উপত্যকার মাঝে রূপসু উপত্যকায় সো-মোরিরি। নীল-সবুজ হ্রদ, ওপারে চাংসের কাংড়ি আর লুংসের কাংড়ির তুষারশিখর। কনকনে হাওয়ার দাপট আর বরফ পাহাড়ের হিমছোঁয়া। একটা স্বপ্নময় জগৎ - যেখানে যাযাবরী উপকথার মেয়েটা নীল জলে ভেসে বেড়ায় আজও। ইচ্ছেডানায় ভর করে সেই কল্পরাজ্যে পৌঁছালেন **সুপ্রতিম ঘোষ**।*

অচেনা উটি

*প্রকৃতির সঙ্গে রোমান্স থেকে রোমাঞ্চ - নীলগিরির অরণ্যে লুকিয়ে থাকা সবুজে ঘেরা হ্রদগুলি ভ্রামণিকের চোখে নতুন করে আবিষ্কার করলেন **সুমিত চক্রবর্তী**।*

ভুবনডাঙা

স্বপ্নের দেশে একদিন

*কোথাও আমার হারিয়ে যাবার নেই মানা - না মনে মনে নয়, প্যারিসের ডিজনিল্যান্ডে ভুতের রাজ্য, নক্ষত্রলোক, মিকি-মিনি আর স্লিপিং বিউটির দুনিয়ায় দিনভর হারিয়ে গিয়ে ছেলেবেলায় ফিরলেন**মহুয়া বন্দ্যোপাধ্যায়**।*

www.amaderchhuti.com

শেষ পাতা

বাংরিপোশির হাতছানি

*ছোট্ট ছুটির রোমান্টিক নাম বাংরিপোশি - নদীর টলটলে জল, দূরের সবুজ টিলা আর আকাশভরা তারার গল্প শোনালেন **সুদীপ্ত মজুমদার**।*

To view this site correctly, please click here to download the Bangla Font and copy it to your c:\windows\Fonts directory.

For any queries/complaints, please contact admin@amaderchhuti.com

© 2011 - AmaderChhuti.com • Web Design: Madhuwanti Basu

Best viewed in FF or IE at a resolution of 1024x768 or higher

কথোপকথন

পশ্চিমবঙ্গ থেকে প্রথম পর্যটন পত্রিকাটি প্রকাশিত হয় ইংরেজি ভাষায় - অতীন্দ্র শংকর রায়ের সম্পাদনায় ‘Indian Tourist’। এটা ষাটের দশকের শেষ দিকের কথা। সম্ভবত ১৯৭৬ সালে পত্রিকাটি বন্ধ হয়ে যায়। প্রায় কাছাকাছি সময়েই ১৯৬৭ সালের অক্টোবর মাসে কলকাতা থেকে প্রকাশিত হয় বাংলাভাষায় প্রথম পর্যটন পত্রিকা ‘ভ্রমণ কাব্য’। ভ্রমণ সংক্রান্ত লেখালেখি মুখ্য হলেও এই পত্রিকাটি অনেকাংশেই ছিল সাহিত্য পত্রিকা। ত্রৈমাসিক হিসাবে শুরু হলেও ১৯৭০ সালে এটি মাসিক পত্রিকায় রূপান্তরিত হয়। ১৯৭৫ সালে সম্পাদক মনোজ দাসের প্রয়াণে বন্ধ হয়ে যায় পত্রিকাটি। ১৯৭১ সালের অক্টোবর মাসে প্রতাপাদিত্য মল্লিক এবং প্রমোদাদিত্য মল্লিকের উদ্যোগে বাংলাভাষায় প্রথম পূর্ণাঙ্গ ভ্রমণ পত্রিকা ‘ভ্রমণ বার্তা’র জন্ম হয়। ভ্রমণ কাহিনির পাশাপাশি এতে নানান জায়গায় বেড়ানোর নতুন নতুন তথ্য, পথঘাটের হদিস - এসব বিষয়ে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়। চুঁচুড়ার জোড়াঘাটে গঙ্গার জলছোঁয়া মল্লিক বাড়িতে একটা ট্রাঙ্কের ওপর আরেকটা ট্রাঙ্ক রেখে শুরু হয় পত্রিকার অফিস। রেনু বাগচী, নীতিশচন্দ্র বাগচী, সুভাষ সমাজদার, শম্ভূনাথ দাস, অবধূত, সম্রাট সেন, শঙ্কু মহারাজ, দিলীপ মিত্র, ভূপতিরঞ্জন দাস, প্রবোধ সান্যাল, উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় কে না ছিলেন এই পত্রিকা গড়ে ওঠার পেছনে। তারপর দীর্ঘ চল্লিশ বছর কেটে গেছে - ‘ভ্রমণ বার্তা’র ছায়ায় গড়ে ওঠা ‘ভ্রমণ বার্তা পরিবার’-এর উপরেই এখন পত্রিকার দায়িত্ব। অজস্র বাণিজ্যিক ভ্রমণ পত্রিকার ভিড়ে আজ আর সেই রমরমাও নেই, কিন্তু ছিয়াত্তর বছর বয়সেও পুরনো সেই লেটার প্রেস ঘরটায় বসে ঐতিহ্যশালী এই পত্রিকাকে বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা করে যাচ্ছেন সম্পাদক প্রমোদাদিত্য মল্লিক।

www.amaderchhuti.com

সময়ের দূরত্বটা চল্লিশ বছরের, মাধ্যমটাও আলাদা, তবু কোথাও যেন ‘ভ্রমণ বার্তা’র সঙ্গে ‘আমাদের ছুটি’র একটা নিবিড় আত্মীয়তা অনুভব করছিলাম। ১৯৭১ সালের অক্টোবর মাসে ভূমিষ্ঠ হয়েছিল বাংলায় প্রথম পূর্ণাঙ্গ ভ্রমণ পত্রিকা ‘ভ্রমণ বার্তা’। আর ২০১১ সালের মে মাসে জন্ম হল বাংলায় প্রথম আন্তর্জাল ভ্রমণ পত্রিকা ‘আমাদের ছুটি’-র। শীতের রোদ মাখা এক সকালে চুঁচুড়ার জোড়াঘাটে গঙ্গার তীরে ‘ভ্রমণ বার্তা’র কার্যালয়ে বসে শিক্ষার্থীর পাঠ নিচ্ছিলাম ছিয়াত্তরের নবীন সম্পাদক প্রমোদাদিত্য মল্লিকের কাছে। গল্পে-কথায় উঠে এল ভ্রমণবার্তার জন্ম থেকে বড় হওয়ার নানান মুহূর্তের সুখ-দুঃখের কাহিনি - যা আমাদের জোগাল এগিয়ে চলার অনুপ্রেরণা।

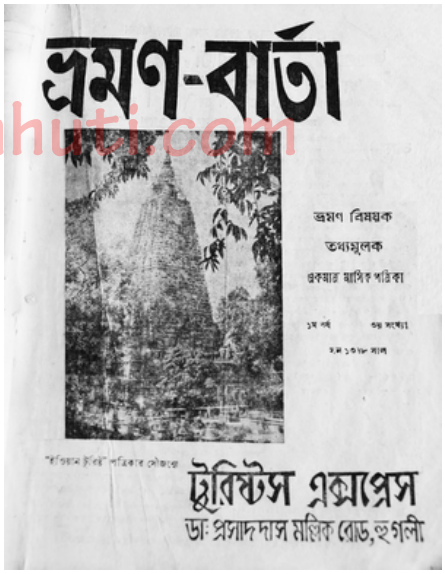

◆ ১৯৭১ সালে যখন ‘ভ্রমণ বার্তা’ প্রকাশিত হয়েছিল তখন বাঙালির মধ্যে তো এখন যে বেড়াতে যাওয়ার উৎসাহটা দেখা যায় ঠিক সেরকমটা ছিল না। সেই পরিপ্রেক্ষিতে হঠাৎ একটা ভ্রমণ পত্রিকা করার কথাটা মাথায় এল কেন? শুধুই কি শখ নাকি পেশার জন্যও?

◆ ‘ভ্রমণ বার্তা’ আমার পেশা, নেশা সবকিছুই। সেইসময় বাঙালি খুব কমই বেড়ানোর জন্য বেড়াতে যেত। বেশিরভাগই তীর্থ করতে যেতেন তার বাইরে বড়জোর পুরী-দার্জিলিং। তাওতো পুরীও তীর্থক্ষেত্রই হয়ে গেল। ‘ভ্রমণ বার্তা’র মাধ্যমে আমরা চেষ্টা শুরু করেছিলাম বাঙালিকে ভ্রমণমুখী করে তুলতে - সব দিক দিয়েই। ‘ভ্রমণ বার্তা’র আগে একটি বাংলা ভ্রমণ পত্রিকা ছিল - মনোজ দাসের 'ভ্রমণ কাব্য'। কিন্তু সেটা ছিল পুরোপুরিই সাহিত্যভিত্তিক। ভ্রমণের লেখায় তথ্যের প্রয়োজনীয়তার কথা আমরাই প্রথম বলি। ‘ভ্রমণ বার্তা’র পরিচয় হল 'তথ্য বিষয়ক ও তথ্যমূলক'। ‘ভ্রমণ বার্তা’র চতুর্থ সংখ্যায় আমরাই প্রথম বলেছিলাম - ট্যুরিজম ইজ আ ইন্ডাস্ট্রি। আমার টাকা পয়সা ছিল না, এখনও নেই, তাই ‘ভ্রমণ বার্তা’কে দাঁড় করাতে পারলাম না, কিন্তু দেখ, আমার কথাটা আজ কিন্তু সত্যি হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে ভ্রমণকে কেন্দ্র করে বহু মানুষের রুজি রোজগার হয়েছে, হচ্ছেও। এইসবের পেছনে হয়তো ‘ভ্রমণ বার্তা’রও কিছুটা অবদান আছে। আজকের হলিডে হোম-এর পরিকল্পনাও শুরু করেছিল ‘ভ্রমণ বার্তা’ই। আমরা বলেছিলাম, চার-পাঁচজন বন্ধুবান্ধব মিলে কোন দর্শনীয় স্থানে গিয়ে একটা বাড়িভাড়া নিন। একেকসময় একেকজন গিয়ে কিছুদিনের জন্য সেখানে থাকুন আবার যাঁরা ওখানে বেড়াতে যেতে চান তাঁদেরকেও ঘরগুলো কয়েকদিনের জন্য ভাড়া দিন। তাহলে আপনাদের ব্যবসাও হবে আবার বেড়াতে গিয়ে থাকার জায়গাও হবে। এই পত্রিকাই প্রথম ডাক দিয়েছিল - ভ্রমণ করুন, ভ্রমণের মাধ্যমে দেশকে দেখুন ও জানুন আর সঙ্গে রাখুন একটি পত্রিকা। আসলে ‘ভ্রমণ বার্তা’ ছিল একটা আন্দোলন, পত্রিকাটি হল সেই আন্দোলনের একটা অন্যতম উপকরণ।

◆ ‘ভ্রমণ বার্তা’র প্রথম দিককার গল্প একটু বলুন না। কীভাবে পথ চলা শুরু হল? কারা ছিলেন সেদিন আপনাদের পাশে?

• আমার দাদা প্রতাপাদিত্য মল্লিক হেঁটে ও সাইকেলে সারা ভারতবর্ষ ভ্রমণ করেছেন সেই পঞ্চাশের দশকেই। দাদার স্বপ্ন ছিল পাইলট হওয়ার। সে স্বপ্নও একসময় পূরণ করেছেন অনেক পরিশ্রম করে। ফিরে এসে উনি একটা ট্যুর কনডাক্ট অফিস খোলেন। ভ্রমণ পত্রিকা বার করার কথাটাও দাদার মাথাতেই প্রথম আসে। নীতিশচন্দ্র বাগচী ছিলেন প্রধান উপদেষ্টা। নীতিশবাবুই আমাদের পাঠিয়েছিলেন সুভাষ সমাজদারের কাছে। সুভাষ সমাজদার তখন ন্যাশনাল লাইব্রেরীর রিডিং বিভাগের ইনচার্জ। এটা পত্রিকা বেরনোর আগের কথা। ওনার কাছে গেছিলাম ন্যাশনাল লাইব্রেরীতে ভ্রমণ সম্পর্কে কী পত্র পত্রিকা আছে সেটা দেখার জন্য। পরবর্তীকালেও ওনার কাছ থেকে নানাভাবে খুব সাহায্য পেয়েছি। সুভাষদাই শঙ্কু মহারাজের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন। শঙ্কুদা দিয়েছিলেন শম্ভুনাথ দাসের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে প্রবোধ সান্যালের বাড়িতে। প্রবোধ সান্যালের বাড়িতে তখন হিমালয়ান ফেডারেশনের অফিস ছিল। সেখানে নিয়মিতই যেতাম। সেইসময় অনেক খ্যাতনামা পর্বতারোহীর সংস্পর্শে এসেছি। আর উত্তরপাড়ায় ছিল ওয়েস্ট বেঙ্গল ট্যুরিস্ট অ্যাসোসিয়েশন আর ইয়ুথ হস্টেল অ্যাসোসিয়েশন। ইয়ুথ হস্টেল অ্যাসোসিয়েশনের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন অরুণ বাগচি। তাঁর কাছ থেকেও অনেক সাহায্য পেয়েছি। পরে মেজদা বলতাম যাঁকে সেই ভূপতিরঞ্জন দাসও প্রচুর উৎসাহ দিয়েছেন, নিয়মিত লিখেছেন ‘ভ্রমণ বার্তা’য়। ইনিও সারা ভারতবর্ষ ঘুরেছেন। শঙ্কু মহারাজ অর্থাৎ জ্যোতির্ময় ঘোষ দস্তিদার, সম্রাট সেন, শম্ভুনাথ দাস, ‘হিমবন্ত’ পত্রিকার সম্পাদক কমল গুহ - এঁরা তো নিয়মিতই আসতেন। প্রবোধ সান্যাল, উমাপ্রসাদও এসেছেন।

ভ্রমণবার্তা প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৭১ সালের মহালয়ায়। ডবল ক্রাউন, লালচে নিউজ প্রিন্টে ছাপা শরৎ ভ্রমণ। দাম ৪ আনা। অনেকেই সন্দেহ প্রকাশ করেছিলেন এই পত্রিকা টিঁকবে তো? সাবধান করেছিলেন যে, ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়াতে হবে, তাতে বিপদ আছে। প্রথম সংখ্যা পনের দিনের মধ্যেই ফুরিয়ে গেল আর দেখলাম মোষ তাড়াতে বেশ মজাই পাচ্ছি। সেই শুরু। তখন পত্রিকা নিয়ে সাইকেলে চড়ে চক্কর দিয়েছি শ্রীরামপুর, বৈদ্যবাটি, ব্যান্ডেল, ত্রিবেণী, মগরা। কলকাতার স্টলে স্টলে নিজের হাতে পত্রিকা দিয়ে এসেছি। বিজ্ঞাপনের জন্য ঘুরে বেড়িয়েছি। তবে সেইসব দিনগুলো অন্যরকম ছিল। চল্লিশ বছর আগে যখন ‘ভ্রমণ বার্তা’ প্রথম ভ্রমণ রসিকদের হাতে আসে তখন ভ্রমণ বিষয়ে আর কোন পত্রিকা ছিলনা। সকলে উৎসাহ নিয়ে এগিয়ে এসেছেন, কতভাবে সাহায্য করেছেন। এখনতো কর্মী পাওয়া যায়না, পয়সা দিয়ে কর্মচারী রাখতে হয়। আমার সেই সামর্থ্য নেই।

প্রথমে ছিল মাসিক, পরে পাক্ষিক। একসময়ে সাপ্তাহিকও করেছিলাম। অনেকেই বলেছেন পত্রিকার গ্ল্যামারটাই আসল। কিন্তু আমার মনে হয়েছে পত্রিকার একটা

সংখ্যা হয়তো দারুণ করে বের করলাম, তারপরে আর বের করতেই পারলাম না, তার তো কোন মানে হয় না। আমি যেভাবে একে বাঁচিয়ে রাখতে পারব সেভাবেই এগোবো। অনেকে সাবধান করেছেন এই বলে যে তুমি যখন প্রথম এটা শুরু করেছ, প্রথম সংখ্যা থেকেই দেখবে বড় বড় যারা পত্রপত্রিকা করে তারা তোমার প্রতিটি পদক্ষেপের দিকে নজর রাখবে। একদিন তুমি হয়তো সফল হবে, এর একটা মার্কেট তৈরি করবে, কিন্তু জানবে সেই মার্কেটটা ক্যাপচার করবে ওই বড় বড় পত্রপত্রিকা। তার সুযোগটা তুমি পাবে না। তোমার পত্রিকা হয়তো উঠে যাবেনা, কিন্তু ফলটা ভোগ করবে ওরা। আমি কিন্তু এই সব কিছু প্রথম থেকে জেনে বুঝেই এগিয়েছি। তবু খারাপ লাগা একটা থেকেই যায়।

◆ ১৯৭২ সালের অক্টোবরে হুগলীতে প্রথম পশ্চিমবঙ্গ পর্যটন সম্মেলন হয়। উদ্যোক্তা ছিল ‘ভ্রমণ বার্তা’। এরপরেও আপনারা বিভিন্ন জায়গায় ট্যুরিস্ট ফেস্টিভ্যাল করেছেন। শুধু একটা পত্রিকা চালিয়ে নিয়ে যাওয়াটাই বেশ শক্ত কাজ। তার সঙ্গে এত কিছু করা মানে বনের মোষ তাড়ানোটা একটু বেশি হয়ে গেল না কি?

• ওই যে তোমাকে বললাম, ‘ভ্রমণ বার্তা’ শুধু একটা পত্রিকা নয়, একটা আন্দোলন। ‘ভ্রমণ বার্তা’র মূল উদ্দেশ্য মানুষকে ভ্রমণ সম্পর্কে আগ্রহী করে তোলা এবং ভ্রমণকে একটা ইন্ডাস্ট্রি হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা। পশ্চিমবঙ্গেই প্রচুর দেখার জায়গা আছে অথচ মানুষ যায় না। এটা আমরা সেই শুরুর থেকে বলে এসেছি। আসলে জানেনা বলেই যায়না। পর্যটন সম্মেলনে আমরা পশ্চিমবঙ্গের প্রত্যেকটা জেলা ধরে মানচিত্র দিয়ে, তথ্য দিয়ে মোট ১৫০টা স্পট তুলে ধরি। ট্যুরিজম ডিপার্টমেন্টে গিয়ে নিয়মিত খোঁচাতাম যে পশ্চিমবঙ্গকে নিয়ে প্রচার করেন না কেন? সুন্দরবনকে আমরাই প্রথম প্রচারের আলোয় আনি।

আমার বাবা গোপেশ চন্দ্র মল্লিক ছিলেন ফ্রিডম ফাইটার, নেতাজীর অনুগামী। সেই সূত্রে আমি প্রথমবার আন্দামানে গিয়েছিলাম স্বাধীনতা সংগ্রামীদের একটা দলের সঙ্গে। ফলে আন্দামানে নেমেই বিভিন্ন সরকারি আধিকারিকের সঙ্গে পরিচয় হয়ে গিয়েছিল। পরবর্তীকালে আন্দামানে ট্যুরিস্ট ফেস্টিভ্যাল করার প্রস্তাব, উৎসাহ, সহায়তা সবই এঁদের কাছ থেকেই পেয়েছি। মজার কথা এই যে ওখানে কাগজে, রেডিওয় সর্বত্র প্রচার হয়েছিল যে ‘ভ্রমণ বার্তা’ই এটা করছে। যখন গভর্নর উদ্বোধন করলেন তখন সবাই জানতে পারল যে এটা সরকারের সঙ্গে যৌথ প্রয়াস। এছাড়া নেপালের কাঠমান্ডুতেও আমরা ট্যুরিস্ট ফেস্টিভ্যাল করেছি। সেও আরেক গল্প।

www.amaderchhuti.com

◆ইদানীং পশ্চিমবঙ্গ পর্যটন উন্নয়ন নিয়ে নানান চিন্তা ভাবনা নতুন করে শুরু হচ্ছে। এ ব্যাপারে আপনার কী মনে হয়?

• দেখো, প্রথম সংখ্যা থেকেই আমরা লিখেছিলাম যে ঘরের পাশে অনেক দেখার জায়গা আছে। সপ্তাহে একটা দিন বাড়িতেই যা খাবার আছে বেঁধে নিয়ে যদি কাছাকাছি যাওয়া যায় তাহলে পরিবারের সবার মধ্যে একটা আত্মিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে। যেমন ধরো, খড়দাতেই কত দেখবার জিনিস আছে। আমরা ‘ভ্রমণ বার্তা’র ব্যাজ লাগিয়ে খড়দার বিভিন্ন জায়গায় ঘুরেছি। লোকে অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করেছে এরা আবার কারা? আমরা বললাম আপনারাও আসুননা আমাদের সঙ্গে। ঘুরে টুরে বলে, বাবা এখানে এত দেখার জিনিস আছে জানতাম না তো!

‘ভ্রমণ বার্তা’য় প্রথমদিকে ভূপতিরঞ্জন দাসের নিয়মিত কলাম বেরোত, ‘দুয়ার থেকে অদূরে’। কাছাকাছি জায়গায় ভ্রমণ করতে হবে পাঁচ টাকা বাজেটে। খাবারদাবার সব যে যার নিজেরা গুছিয়ে নিয়ে যাবে, গাড়ি ভাড়াটাড়া সব ওই পাঁচ টাকার মধ্যে। সেখানে তিনি একজায়গায় লিখেছেন যে একবার ঠিক হল ছ’জনে মিলে কোথাও একটা যাওয়া হবে। শেয়ালদা স্টেশনে এসে দেখা গেল চারজন এসেছে, দু’জন আসেনি। ঠিক আছে, যতজন এসেছে ততজনই চল। সেখানে নেমে দেখে চায়ের দোকান একজন হাঁকছে, এই যে, আমি এখানে বসে আছি। তিনি এসেছে অন্য একটা রুটে। রুটটা বলা হয়ে গেল। আবার কিছুটা এগিয়ে আরেকজনের সঙ্গে দেখা। তিনি আবার আর এক পথে এসে পৌঁছেছেন। তাঁদের কথার মধ্যেই কিন্তু ওই জায়গাটায় যাওয়ার তিনটে রাস্তার কথাই বলা হয়ে গেল। এরপর তিনি করেছিলেন ‘রেললাইনের দুধারে’ অর্থাৎ ১০০ কিলোমিটারের মধ্যে কাছের রেলস্টেশন গুলিতে কী কী দর্শনীয় আছে।

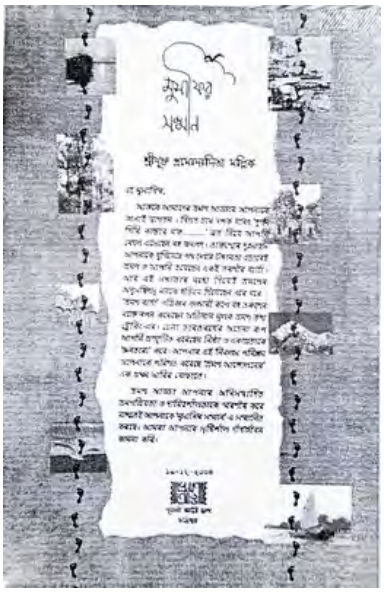

পশ্চিমবঙ্গের ভ্রমণকে জনপ্রিয় করার আরও একটা চেষ্টা করেছিলাম আমরা। ‘পশ্চিমবঙ্গ পর্যটন গবেষণা ও প্রচার সমিতি’ -এই নামে সংগঠনের রেজিস্ট্রেশনও করা হয়েছিল। পরিকল্পনাটা এরকম ছিল যে আগ্রহীরা এখানে বসে ‘ভ্রমণ বার্তা’ পড়বেন, এখানে প্রচুর বই আছে, সেসব দেখবেন। তারপর একেকজন একেকটা জায়গা বেছে নেবেন ও তার ওপরে গবেষণা করবেন। আমরা সেইসব জায়গায় ট্যুর করব। ট্যুরে তাঁরা বিনা খরচায় যাবেন। তাঁরা যেটা লিখছেন সেটাকে মিলিয়ে দেখবেন ঠিক হয়েছে কিনা, প্রয়োজনে আপডেট করবেন। যদি এই রিসার্চ প্রজেক্টটা আমরা ঠিকমত গড়ে তুলতে পারতাম তাহলে সরকারী সাহায্যও নিশ্চয় পেতাম। তখন তাঁদেরও আমরা কাজের জন্য অর্থ দিতে পারতাম।

ওয়েস্ট বেঙ্গল ট্যুরিজম থেকে যখন প্রথম ট্যুরিস্ট গাইডবুক তৈরির পরিকল্পনা হল, ডিরেক্টর আমাকে ডেকে পরামর্শ চেয়েছিলেন কীভাবে করা যায়। আমি মেজদাকে নিয়ে গিয়ে দুজনে মিলে ছকে দিলাম কীভাবে কী হবে। যদিও তার কোন স্বীকৃতি পাইনি। ‘ভ্রমণ সঙ্গী’-র কথা নিশ্চয় জানেন, ওদের বইটাও প্রথম এখান থেকে একটা ফাইল নিয়ে গিয়ে শুরু হয়েছিল, পরবর্তীকালে ওরা লোক পাঠিয়ে বিভিন্ন জায়গার অজস্র তথ্য সংগ্রহ করে একটা অসাধারণ কাজ করেছে।

◆আপনার নিজের বেড়ানোর গল্প একটু বলুন। সবচেয়ে প্রিয় জায়গা কোনটা?

• অনেক জায়গাতেই তো গেছি, তাই সবচেয়ে প্রিয় কোনটা বলা মুশকিল। আন্দামানের কথা বলা যেতে পারে। তবে আমার চিন্তাভাবনা সবসময় পশ্চিমবঙ্গকে ঘিরেই। কী করে পশ্চিমবঙ্গকে আরও সবার সামনে তুলে ধরা যায়। শিবনিবাস গেছ? চূর্ণী নদী দিয়ে ঘেরা একটা দ্বীপ। বর্গীর হামলার সময় কৃষ্ণনগরের মহারাজা এটা করেছিলেন। ’৭৪ সালের কথা। তখন জল এত স্বচ্ছ ছিল যে পা দিলে পায়ের নখ পর্যন্ত দেখা যেত, এখন শুকিয়ে গেছে। দু’টো মন্দির আছে। শিবলিঙ্গটি লম্বায় আট ফুট, বেড় চোদ্দ ফুট। সিঁড়ি বেয়ে উঠে মাথায় জল দিতে হয়। তখন লোকে নামও জানত না। আমরা ‘ভ্রমণ বার্তা’য় বার করি, এখান থেকে লোকজনকে বেড়াতে নিয়ে যাই। অন্য একটা গল্প বলি, একটা মজার ঘটনা মনে পড়ছে - আমরা একবার পাণ্ডুয়ার মিনারে গেছি সদলবলে। বসে আছি, কেয়ারটেকার এসে চাবি খুলে দিলে মিনারে উঠব। হঠাৎ দেখি একটা বিরাট বাস এসে দাঁড়াল। আমি একজনকে বললাম, দেখতো কোথা থেকে বাসটা এল, কারা এল? খোঁজ নিয়ে দেখে ট্যুরিজম ডিপার্টমেন্ট। আপনারা? ‘ভ্রমণ বার্তা’। ‘ভ্রমণ বার্তা’! প্রমোদ মল্লিক আছেন? হ্যাঁ আছেন। ওঁকে ডাকুনতো। আমিতো গেছি। গিয়ে জানতে চাই, আপনারা এখানে কেন? আপনিই তো মশাই, আপনার জন্যই তো এসব হয়েছে। কোথায় শিবনিবাস, কোথায় কালনা, কোথায় ইয়ে -আপনিই তো ঢুকিয়েছেন সব জোর করে। আপনারা এখানে কী জন্য এসেছেন? বললাম, মিনারে ওঠার জন্য। হাতজোড় করছি মশাই,

এঁদের সামনে আর বলবেন না, তাহলে এঁরাও বলবেন আমরা মিনারে উঠব, আমাদের ট্যুরটার বারটা বেজে যাবে।

◆প্রতি মাসে'ভ্রমণ বার্তা'র বৈঠক বসে। এও কি সেই প্রথম থেকেই?

• মাসের দ্বিতীয় শনিবারে আমাদের মিটিং বসে, ভ্রমণ আলোচনা হয়, কাগজেই দেওয়া থাকে পরের বারের তারিখ-সময়, যাতে নতুন কেউও পত্রিকা পড়ে ওই দিন হাজির হতে পারেন, এও সেই প্রথম থেকেই। এই আড্ডায় বিখ্যাত সব ভ্রামণিক, ভ্রমণ লেখকেরা এসেছেন। এখন এই ঘরটাতেই সকলে বসেন, তিরিশ-চল্লিশ জন লোক হয়ে যায়। আগেতো বাইরে হোত। তখন দেড়শো-দুশো জন হয়ে যেত। 'ভ্রমণ বার্তা'র এই আড্ডাতেই আলাপ হয়ে কত মানুষ পরস্পরের আজীবন বন্ধু হয়ে গেছেন, একসঙ্গে বেড়াতে গেছেন, ক্লাব তৈরি করেছেন। আবার 'ভ্রমণ বার্তা'কে নিয়ে কত আলোচনা-সমালোচনা হয়েছে। সব সমালোচনা মাথা পেতে নিয়েছি, চেষ্টা করেছি কী করে আরও ভালো করা যায়। একবার কলকাতায় আড্ডা বসেছে। আমাদের নিয়ম হচ্ছে, নতুন যাঁরা তাঁরা প্রথমে নিজের পরিচয় দেবেন। এক ভদ্রলোক উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, আমি প্রথমেই আপনাদের কাছে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। কেন? এক বন্ধু আমায় একটা 'ভ্রমণ বার্তা' দিচ্ছিলেন। আমার কাছে দাম চাইতে আমি বললাম কী হবে এটা দিয়ে, ছেলের দুধ গরম করা যাবে? তারপর সেইদিনই খুব বৃষ্টি হচ্ছে, দমদম স্টেশনে একটা স্টলে দাঁড়িয়ে আছি। বই ঘাঁটতে ঘাঁটতে দেখি একটা 'ভ্রমণ বার্তা'। পড়তে পড়তে ট্রেন এসে গেছে। জিজ্ঞাসা করলাম কত? বলল ২৫ পয়সা। আমি দামটা দিয়ে পত্রিকাটা নিয়ে ট্রেনে উঠে পড়লাম। সেইটাতে দেখেই আপনাদের এখানে এসেছি আমি। আমি যে মন্তব্যটা করেছিলাম, সেটা আমার সত্যিই অন্যায় হয়েছে, আমাকে আপনাদের আজীবন গ্রাহক করে নিন।

◆ দীর্ঘ চল্লিশ বছরের অভিজ্ঞতায়'ভ্রমণ বার্তা'কে ঘিরে আপনার সবচেয়ে ভালোলাগা-মন্দলাগার অনুভূতি কি?

• 'ভ্রমণ বার্তা'-ই আমার সবকিছু। যদিও 'ভ্রমণ বার্তা' করার যাবতীয় কৃতিত্ব 'ভ্রমণ বার্তা'র লেখকদের। আমি কেবল সতরঞ্চি পেতেছি আর তুলেছি। লেখক, গ্রাহক, পাঠকরাই সেখানে এসেছেন, পরস্পরের অভিজ্ঞতা আদান প্রদানের মধ্য দিয়ে 'ভ্রমণ বার্তা'-কে সমৃদ্ধ করেছেন। 'ভ্রমণ বার্তা' সম্পাদনার সুবাদে অনেক স্নেহ, ভালোবাসা, সম্মান পেয়েছি। এটাই আমার বড় পাওনা। ভালোলাগার স্মৃতি বলতে তো অনেক কিছু -গুরুর সেই দিনগুলো, এতবছরের কত টুকরো টুকরো স্মৃতি, ভদ্রেশ্বরের সংগঠন 'ভ্রমণ আড্ডা'-র দেওয়া মুসাফির পুরস্কার সবকিছুই মনে পড়ে।

আমি নিজে অন্য কিছুই করিনি, এমনকী চাকরি বাকরি-ও ছেড়েছি এই ভ্রমণবার্তার জন্যই। দুঃখ লাগে যে টাকা পয়সা না থাকায় পত্রিকাটাকে সেভাবে দাঁড় করাতে পারলাম না। যখন বুঝলাম যে আর চালাতেই পারব না তখন সবাইকে ডেকে ট্রাস্ট বানিয়ে 'ভ্রমণ বার্তা পরিবারে'র হাতে পত্রিকাটা তুলে দিয়েছি। কিন্তু তাতেও যে বিশেষ কিছু সমাধান হয়েছে তা নয়। সবচেয়ে আক্ষেপ লাগে যে সত্যিকারের কোন উত্তরসূরী তৈরি করতে পারলাম না।

◆'ভ্রমণ বার্তা'র জন্মের চল্লিশ বছর পরে প্রথম আন্তর্জাল ভ্রমণপত্রিকা 'আমাদের ছুটি'র জন্ম। আপনার অভিজ্ঞতা আমাদের পাথেয়। 'আমাদের ছুটি'র জন্য আপনার বার্তা কী?

• নিশ্চয় তোমাদের এই উদ্যোগ সফল হবে। যাঁরা ঘুরে বেড়ান তাঁদের অভিজ্ঞতা তুলে ধরতে হবে, সেটাই আরেকজনের কাজে লাগবে। তাহলে মানুষও তোমাদের পত্রিকাটি সম্বন্ধে আগ্রহী হয়ে উঠবেন। তবে একটা কথা মনে রাখবে অর্থের জোর না থাকলে কিন্তু প্রতিযোগিতার বাজারে টিকে থাকাটা শক্ত। তুমি একটা নতুন কিছু করলে, তার সুযোগটা সদ্ ব্যবহার করবে অন্যে। এইটা মাথায় রেখেই এগিয়ো।

www.amaderchhuti.com

সাক্ষাৎকার - দময়ন্তী দাশগুপ্ত

Rate This : - select -
Total Votes : 3
Average : 3.67

Like One person likes this.

tell a Friend

Post Comments

To view this site correctly, please click here to download the Bangla Font and copy it to your c:\windows\Fonts directory.

For any queries/complaints, please contact admin@amaderchhuti.com
© 2011 - AmaderChhuti.com • Web Design: Madhuwanti Basu
Best viewed in FF or IE at a resolution of 1024x768 or higher

ইতিহাসও কথা বলে

দেবাশিস মজুমদার

~ মুর্শিদাবাদের তথ্য ~ ‖ ~ মুর্শিদাবাদের ছবি ~

রাতের লালগোলা প্যাসেঞ্জার যখন মুর্শিদাবাদ স্টেশনে পৌঁছোল তখন প্রায় ভোর ছ'টা। সবেমাত্র আলো ফুটেছে। নির্জন স্টেশনে নামতেই ডিসেম্বরের কনকনে ঠান্ডা আমাদের স্বাগত জানাল তার হিমশীতল স্পর্শে। কুয়াশাচ্ছন্ন স্টেশনের চারিদিকে তাকিয়ে মনে হচ্ছিল, আমরা যেন এক মায়াপুরীর দ্বারপ্রান্তে এসে উপস্থিত হয়েছি। এই দরজার ওপারেই আমাদের জন্য অপেক্ষা করে আছে সুবা বাংলার নবাবী ইতিহাসের প্রাণকেন্দ্র।

চার বন্ধু মিলে ডিসেম্বরের শীতে কয়েকদিনের ছুটি নিয়ে মুর্শিদাবাদ বেড়াতে এসেছি। আইডিয়াটা অবশ্য আমারই। ইতিহাসের ছাত্র হিসাবে বাংলার নবাবী আমলের রাজধানীকে কাছ থেকে দেখার ইচ্ছাটা অনেকদিনের, কিন্তু হয়ে ওঠেনি এর আগে।

স্টেশনের বাইরে এসে কোনও যানবাহন দেখতে পেলাম না। তবে কিছুক্ষণের মধ্যেই রহস্যময় কুয়াশার বেড়াজাল কেটে একটা টাঙ্গা এসে দাঁড়াল আমাদের সামনে। দরদাম করে চারজনে তাতেই উঠে পড়লাম। টাঙ্গা চলল লালবাগের ইয়ুথ হোস্টেলের উদ্দেশে। সেখানে আমাদের থাকার ব্যবস্থা করা আছে। বড়দিনের ছুটি পড়তে প্রায় সপ্তাহখানেক বাকি, তাই ইয়ুথ হোস্টেল এখন একদম ফাঁকা।

হোস্টেলের লনে এসে দাঁড়াতে চোখ চলে গেল নির্জন প্রান্তর জুড়ে দাঁড়িয়ে থাকা বিশাল ইমামবাড়ার দিকে। প্রথম দৃষ্টিতে মনে হল নবাবী যুগের ইতিহাসের এক অনন্য সাক্ষ্যকে তার কাঁধে নিয়ে এখনও দাঁড়িয়ে রয়েছে এই বৃদ্ধ ইমারতটি।

www.amaderchhuti.com

বড় ইমামবাড়া — আলোকচিত্রী – শান্তনু রায়

সকালে যে টাঙ্গায় চড়ে হোস্টেলে এসেছিলাম সেটাকেই সারাদিনের জন্য ভাড়া নিয়ে নেওয়া হয়েছিল। কাছেই এক দোকানে জলখাবার সেরে নিয়ে টাঙ্গায় চড়ে রওনা দিলাম মুর্শিদাবাদ দর্শনে।

মুর্শিদাবাদে নবাবী শাসনের পত্তন হয়েছিল অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে নবাব মুর্শিদকুলি খাঁ-র আমলে। ইতিহাসের শুরু থেকেই শুরু করলাম আমাদের ভ্রমণ। কাটরা মসজিদের পেছনেই রয়েছে নবাব মুর্শিদকুলি খাঁ-র সমাধি। বিশালব্যপ্ত কাটরা মসজিদের অসাধারণ শিল্প কারুকার্য মন ভরিয়ে দিল আর মুর্শিদকুলি খাঁ এর সমাধিস্থলের সামনে দাঁড়িয়ে মনে হল যেন সশরীরেই ইতিহাসকে প্রত্যক্ষ করছি।

কাটরা মসজিদ থেকে বেরিয়ে চললাম দ্বিতীয় গন্তব্যস্থল - ফুটি মসজিদ বা স্থানীয় ভাষায় ফুটা মসজিদ। দেখি চরম অযত্নে প্রায় ভগ্নপ্রায় অবস্থায় দাঁড়িয়ে রয়েছে এক প্রকান্ড ইমারত। শোনা যায়, নবাব সরফরাজ খান তাঁর অক্ষয়কীর্তি হিসাবে তৈরি করতে চেয়েছিলেন এই মসজিদটিকে। তাই তিনি নাকি এক রাত্তিরের মধ্যেই বিশাল এই মসজিদ বানানোর চেষ্টা করেন। যদিও এ দাবির কোনও ঐতিহাসিক প্রমাণ নেই। তবে কিংবদন্তী অনুসারে সেই রাত্রেই আলিবর্দি খাঁ-র চক্রান্তে খুন হতে হয় সরফরাজ খাঁ-কে, আর মসজিদ নির্মাণও তাই রয়ে যায় অসমাপ্তই।

আমাদের টাঙ্গা এবার ছুটে চলল বিখ্যাত কাঠগোলা বাগানের দিকে। শীতের সকালে রাস্তার দুধারে সর্ষে খেতের পীত ছটার মাঝে প্রকৃতি যেন রূপের বন্যায় নিজেকে উজাড় করে দিয়েছে। সেই মনমোহিনী রূপের হাতছানিতেই বোধহয় নিজেও কিছুটা হারিয়ে গিয়েছিলাম। সম্বিৎ ফিরল কাঠগোলা বাগান কমপ্লেক্সে পৌঁছে।
এখানকার পরিবেশ সত্যিই চমৎকার। কাঠগোলা বাগানেও প্রকৃতি তার রূপরেখা মেলে ধরতে কোনও কার্পণ্য করেনি। মধ্যে মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকা শ্বেত পাথরের মানবমূর্তিগুলো যেন সেই রূপলাবণ্যকে আরও বাড়িয়ে দিয়েছে। তবে এখানকার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন হল বাগানের মাঝে আদিনাথের জৈনমন্দিরটি। বাগান ও মন্দির দর্শন করে বেরিয়ে আসার সময় চোখে পড়ল শ্বেত পাথরে নির্মিত এক পুরুষমূর্তির দিকে। এটি এক হার্মাদের মূর্তি। হার্মাদ অর্থাৎ পর্তুগিজ জলদস্যু। বেপরোয়া এই বিদেশি হানাদারেরা একটা সময় বাংলার নবাবী শাসনের সামনে প্রভূত বিপর্যয়ের সৃষ্টি করেছিল।

কাঠগোলা বাগান থেকে বেরিয়ে টাঙ্গা রওনা দিল লালবাগের অভিমুখে। না এখনই হোস্টেলে ফিরছি না। এবার গন্তব্য নশিপুর রাজবাড়ি। রাজবাড়ির চাকচিক্য এখন ম্রিয়মান আর অবস্থাও ভগ্নপ্রায়। তবে এককালে যে এরও অসাধারণ জৌলুস ছিল তার সাক্ষ্য রয়েছে সর্বত্রই। ইতিহাস বলে এই বংশের আদিপুরুষদের পেশা ছিল দস্যুবৃত্তি - পরে তারাই হন জমিদার। কিংবদন্তী আজও সেইসব নিষ্ঠুর অত্যাচারের কাহিনি বহন করে চলেছে স্থানীয় লোককথায়।

মুর্শিদকুলি খাঁ-র বড় মেয়ে আজিমউন্নিসার সমাধিস্থল - এটিও একটি অভিশপ্ত জায়গা। শোনা যায় এক দুরারোগ্য ব্যাধিতে ক্লিষ্ট আজিমউন্নিসাকে এক কবিরাজ চিকিৎসার উপায় হিসাবে তিন থেকে পাঁচ বছর বয়সি একশোটি শিশুর কলিজা খেতে বলেছিলেন। রাজকুমারীর প্রাণ বাঁচাতে বহু নিষ্পাপ শিশুকে বলিদান দেওয়া হয়। আজিমউন্নিসার সমাধিক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে সেইসব শিশুর করুণ আর্তনাদ যেন কানে বাজতে লাগল, যেন শুনতে পাচ্ছিলাম সন্তানহারা মায়েদের আর্ত চিৎকার। স্থানীয় লোকেরা এই অভিশপ্ত জায়গাটিকে রাক্ষুসে বেগমের সমাধিস্থল নামেই অভিহিত করে।

- এবার কিন্তু খিদে পাচ্ছে।
সমাধি দেখে বেরিয়ে স্বগতোক্তি করল সৌরভ। এতক্ষণে টের পেলাম, খিদেটা আমারও মন্দ পায়নি। অতএব আর কথা না বাড়িয়ে সোজা চলে এলাম লালবাগের একটা হোটেলে। দুপুরের খাওয়া সেরে সামান্য একটু জিরিয়ে নিয়েই চারজনে বেরিয়ে পড়লাম হাজারদুয়ারি দর্শনে।

হাজারদুয়ারি আলোকচিত্রী - সোমনাথ খাসকেল

হাজারদুয়ারি দর্শনের অভিজ্ঞতা ভাষায় প্রকাশ করা খুব কঠিন কাজ। আক্ষরিক অর্থেই এ এক ঐতিহাসিক জাদুঘর। নবাবী আমলের অস্ত্র থেকে শুরু করে তার শিল্প, স্থাপত্য, চিত্রকলা, ঐতিহাসিক দস্তাবেজ প্রভৃতি সবকিছুরই অসাধারণ সব নিদর্শন সংরক্ষিত আছে এই জাদুঘরে। পাশাপাশি কিছু উৎকৃষ্ট পাশ্চাত্য শিল্প নিদর্শন এবং ভারতের ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক ইতিহাসেরও কিছু বিশিষ্ট নিদর্শন সংরক্ষিত আছে। এ দেখার যেন কোনও শেষ নেই। যতই দেখি ততই দেখার ইচ্ছা, জানার ইচ্ছা যেন আরও বেড়ে যায়। শেষমেশ অনিচ্ছাসত্ত্বেও বেরিয়ে আসতেই হল। হাজারদুয়ারির সামনেই বাচ্চেওয়ালি কামান। সব দেখে ইযুথ হোস্টেলে ফিরতে ফিরতে সন্ধে নেমে এল। এতক্ষণে যেন শরীরটা একটু ক্লান্ত লাগল। সন্ধেটা চারজনে ইযুথ হোস্টেলেই গল্পগুজব করে কাটিয়ে দিলাম।

রাত সাড়ে দশটায় ডিনার সারতে বেরোলাম। যে হোটেলে দুপুরের খাওয়া সেরেছিলাম ঠিক করলাম রাতের খাবারও সেখানেই খাব। ইমামবাড়ার পাশ দিয়েই হোটেলে যাওয়ার পায়ে চলা পথ। সকালে যাকে ইতিহাসের ভারে ভারাক্রান্ত এক বৃদ্ধ ইমারত বলে মনে হয়েছিল নির্জন মায়াবী পূর্ণিমা রাতে তাকে মনে হচ্ছিল এক মায়াপুরী। সেই বিশাল ইমারতের পাশের নির্জন প্রান্তর দিয়ে আমরা চারজনে হেঁটে চললাম সদর রাস্তার দিকে। এ এক অদ্ভুত অভিজ্ঞতা। বেশিক্ষণ লাগল না। মিনিট পাঁচেক হাঁটার পরই পাকা রাস্তা পৌঁছে গেলাম। সামনেই আমাদের খাবার হোটেল। খাওয়াদাওয়া সেরে হোস্টেলে ফিরে যে যার ঘরে শুতে চলে গেলাম । ঘুম আসছিলনা। নবাবী যুগের ইতিহাস যেন বার বার ফিরে ফিরে আসছিল আমার মনে।

www.amaderchhuti.com

পরদিন সকাল নটার মধ্যে তৈরি হয়ে বেরিয়ে পড়লাম জাহানকোষা কামান দেখতে। এই কামানটি পলাশি যুদ্ধের সাক্ষী। সেখান থেকে জিপ ভাড়া করে ছুটে চললাম কিরীটেশ্বরী মন্দিরের উদ্দেশে। কিরীটেশ্বরী মন্দির হিন্দুদের অন্যতম পবিত্র তীর্থস্থান। এতক্ষণ যেসব জায়গায় ঘুরেছি সেসব জায়গার থেকে এখানকার পরিবেশ সম্পূর্ণ আলাদা। এই মন্দিরের মাহাত্ম্য ইতিহাসে নয়, পুরাণে এবং ভক্তিতে। বলা হয় সতীর ৫১ পীঠ তীর্থস্থানের অন্যতম হল এই কিরীটেশ্বরী মন্দির।

সাড়ে তিনটে নাগাদ স্থানীয় হোটেলে দুপুরের খাওয়া সেরে রওনা দিলাম খোশবাগের পথে। পড়ন্ত বিকেলের গোধূলি আভায় খোশবাগে এসে নবাব সিরাজ-উদ্‌দৌলার সমাধির সামনে দাঁড়িয়ে এক অনির্বচনীয় উপলব্ধির সাক্ষী হলাম। বাংলার শেষ স্বাধীন নবাবের সমাধির পশ্চাদপটে সূর্য অস্ত যাচ্ছে। ইতিহাসও কথা বলে।

খোসবাগে সূর্যাস্ত আলোকচিত্রী - শান্তনু রায়

ইতিহাসের শিক্ষক দেবাশিস ভালোবাসেন ভারতের ঐতিহাসিক স্থানগুলিতে ঘুরে বেড়াতে। কলকাতার ঔপনিবেশিক ইতিহাস তাঁকে বিশেষ আকর্ষণ করে।

Rate This : - select -
Total Votes : 2
Average : 1.00

Like Be the first of your friends to like this.

tell a Friend

Post Comments

www.amaderchhuti.com

To view this site correctly, please click here to download the Bangla Font and copy it to your c:\windows\Fonts directory.

For any queries/complaints, please contact admin@amaderchhuti.com
© 2011 - AmaderChhuti.com • Web Design: Madhuwanti Basu
Best viewed in FF or IE at a resolution of 1024x768 or higher

হিম মরুর নীল অতলে

সুপ্রতিম ঘোষ

~ তথ্য- লাদাখ ~ সোমোরিরি ~ || ~ সো-মোরিরির ছবি ~ লাদাখের ছবি ~

মাস কয়েক আগের কথা; B.B.-র সাথে একটা সিনেমা হলে; মাল্টিপ্লেক্স নয়, নেহাত সাদামাটা - উত্তর কলকাতার ফিলিম ঘর বলাই বরং ভালো। একটানা হাউসফুল সিনেমার রহস্যটা জানার কৌতূহল হয়েছিল - কিন্তু এ কী! সিনেমা যে গোটা হল জুড়েই শুরু হয়ে যাবে এমনটা তো আশা করিনি - শুরু থেকেই সিটি আর জেন-নেক্সটের নেত্য! সে কথা থাক। বিজ্ঞাপন আর প্রতিবাদী নায়ক চরিত্রের দৌলতে হিট ফিলিম একেবারেই ভুষি! তবে, একটা নাচের সিকোয়েন্সে চোখটা আলটপকা আটকে গেল। সেই গুম্ফা, সেই নীল আকাশ, বৌদ্ধমঠ, খয়েরি-ধূসর লাদাখি পাহাড়- এতো বহু চেনা ছবি - হল থেকে বেরিয়ে B.B.-র সাথে বসে জমাটি গপ্পো শুরু হল এবার। লাদাখের সাতসতেরো। ফকিরামন সেই যে একছুট দিলো - তা-র-প-র, সোজা এই লেখার ছবিতে ল্যান্ডিং। সঙ্গের প্রিয় মানুষ থাকুক না হয় সঙ্গোপনে - My Journey to Ladakh শুরু হল আরও একবার - ফিরে দেখার তাগিদেই।

গিরিবর্ত্মের দেশ। সেখানে গেলে নীল আকাশ আরও বেশি নীল। রুক্ষ পাহাড় উপত্যকার শুখা হলুদ রংটায় নানান শেডস্, ল্যান্ডস্কেপের দুনিয়া। সিন্ধুতীরে বসে ভারতের আদি কথার গপ্পোরাজ্যে মনের অজান্তেই স্মৃতির খোঁজ।

কারাকোরামের বধ্যভূমি পেরিয়ে আফগান বাণিজ্যপথে এখন আর কোনও উটের দল হাঁটে না - জোব্বাধারির দল নদীর পাড়ে কোনও গাঁয়ে তাঁবুও ফেলে না। হিমশীতল মরুপাহাড়ের বুকে এপাহাড় ওপাহাড় ডিঙিয়ে রোজ সূর্যটা সাঁঝ-বিকেলে আঁধার ঘরে ডুব দেয় শুধু। ওখানেই ৯০০ বছরের পুরোনো লামাযুরু গুম্ফা, ওখানেই সাগরঢেউয়ের ছোঁয়াচলাগা প্যাংগং, ওখানেই স্টোক কাংড়ির বরফদেহ ছুঁয়ে থাকা শহর লে - হেমিস, থিকসে, শ্যে, শঙ্কর গুম্ফা আর সিন্ধুনদের উচ্ছলতা - সঅব আছে। দূরে পড়ে থাকা নুব্রা, সো মোরিরি কিম্বা দা, হানুর মতন সুপ্রাচীন আর্যগ্রাম সেসবই আছে লাদাখে। আমার কাছে লাদাখ খুব সুন্দর, কেন জানি না - ভীষণ সুন্দর একটা রূপকথার দেশ।

www.amaderchhuti.com

ধূসর পাহাড় সুপ্রতিম ঘোষ

লে শহর প্রান্তে ঠিক যেখানে শ্যে প্রাসাদটাকে মাথায় করে মেটেরঙা পাহাড়টা বেঁকে উঠেছে - সামনেই রাস্তা, সবুজ জলা, চারণরত ঘোড়ার দল। গুম্ফার নীচে বিরাট উঁচু তিন চোর্তেন, মাঝে রাস্তা, সবুজ ছায়ামাখা সেই রাস্তার ধারেই দু দন্ড বিশ্রামের মুহূর্তে কানে ভেসে আসা পাহাড়িয়া ঝোরার শব্দ আর সেই শব্দস্নাত মনের কোনে ঐ পাহাড় গায়ের সিঁড়ি বেয়ে উঠে যাওয়া কোনও পরবাসী তরুণীর মিস্টিক ফ্রেম।

আগের দিনই লে পৌঁছেছি। আরেক সাতসকালে সো মোরির পথে কোয়ালিস যাত্রা। মাঝে ফেলে আসা সিন্ধুদর্শন ঘাট, থিকসের মতন প্রাচীন বৌদ্ধমঠ, শ্যে প্রাসাদ ইত্যাদি। সে সবও দেখেছি - দুচোখ ভরে। ছবির দুনিয়ায় নতুন করে আমার ছবিগুলোকে ফ্রেমে বাঁধতে চেষ্টা করেছি। পারিনি - যে ছবিকে যেমনি করে দেখতে চাইলুম, তেমনি সহজিয়া রংপ্লাবনে নিকিয়ে নিতে পারলুম না আমার শহুরে ক্যানভাসটাকে। বোধহয় এমনিই হয়। প্রকৃতিকে কোনও রঙে-রেখায় বাঁধা যায় না যে! আমিও কেমন বেআক্কেলে, বেওকুফের মতন ভাবছিলুম বলুন?

হেমন্তে লাদাখ আলোকচিত্রী - সোমা মিত্র

মিলিটারি বেস কারু তারপর সিন্ধু তীরের রাস্তা ধরে সোজা উপসি। একটা ছোট্ট গঞ্জ। ডানদিকে সিন্ধুর গর্জ(Gorge)। সকালের ভারি ব্রেকফাস্টটা এই উপসিতে সারতে হবে। পরের রাস্তা-মাঝের রেস্তোরাঁর নিশ্চয়তা কেউ দিতে পারবে না আর সো-মোরিরি পৌঁছতে পৌঁছতে বিকেল হয়ে যায়।

একটা গাঁ, গোটা চল্লিশেক ঘর ইতিউতি ছড়ানো পাহাড়ের ঢালে ঢালে, শুষ্ক বালির মাঠ। কনকনে হাওয়ার দাপট আর বরফ পাহাড়ের হিমছোঁয়া। এনিয়েই একটা স্বপ্নময় জগৎ। যেখানে তিব্বতী যাযাবর রূপকথার মেয়েটা নীল জলে ভেসে বেড়ায় আজও। ব্যাকুল ইচ্ছেডানায় ভেসে কোনও এক ফাঁকে ঢুকে পড়েছিলাম ওদের সীমানায়। মনের ঘর খুললো এবার। আঁতিপাঁতি করে খুঁজেও এ্যাতোকাল ওকে পাইনি। আসলে কোরজোক গ্রামটা ভারি অদ্ভুত। সো-মোরিরি হ্রদ ছোঁয়ানো তস্য ছোট্ট একটা বসতি বলা যায় একে। শীতের দিনগুলোতে আর্মি রিলিফ আসে সপ্তাহান্তে। আবহাওয়া খুব খারাপ থাকলে সে রিলিফও বন্ধ। তবু ওরা বাঁচে। লড়াই, বেঁচে থাকার যুদ্ধে সব পাহাড়িরাই পারঙ্গম। কিন্তু কোরজোকের গ্রাম্য চাংপারা শতেক তিব্বতী পাহাড় ডিঙানো এক উপজাতি - এরা -৪০ ডিগ্রি সেলসিয়াসেও বাঁচার তরিকা জানে। শুকনো, রোদেসেঁকা মাংস আর বার্লি সঙ্গে লোকাল বিয়র। আট মাসের শীতটাকে ফি বছর ঘরে বসেই কাটিয়ে দেয় এরা।

লে থেকে মাহে, তার ঠিক পরেই সিন্ধু ব্রিজ টপকে রূপসু উপত্যকার পথ। আসলে চুমাথাং পেরনো মাহে থেকে দুটো রাস্তা ভাগ হয়ে গেছে। একটা গিয়েছে নোমার পথে তিব্বতের দিকে, আরেকটা এই রূপসু। সেখানেই সোমোরিরি। তিব্বতীয় যাযাবরদের মেয়ে সো-মোরিরি এখানে রূপকথার গল্পের ছোট্ট নায়িকা। তার ছিল পোষা এক গাধা। সপরিবারে এ পাহাড়-সে পাহাড়, বরফে ঢাকা মাঠ, নদী-ঝরনা পেরিয়ে যেতে যেতে কখন খেলার ছলে দুই বন্ধুতে মিলে হারিয়ে গেছিল ওরা দুটি প্রাণী। শোনা যায়, বরফ ঝড়ের মধ্যে পড়ে পাক খেতে খেতে সো-মোরিরি আর তার অবলা বন্ধু দিশা হারায়, তারপর বহু বছর কেটে গেছে - কেউ ওদের খুঁজেও পায় নি। লোকবিশ্বাস, এই নীল অতলে, হিমেল ঢেউতোলা সরোবরের নিচে আজও শীতঘুমে আছে ওরা।

মায়াবী সোমোরিরি আলোকচিত্রী - সোমা মিত্র

লে থেকে প্রায় ২৩০ কিলোমিটার দূরে ১৫,০০০ ফুট উচ্চতায় সো-মোরিরি। পৌঁছবার বেশ কিছুটা আগেই রাস্তা পাশে সবুজ ঘাসজমির দিকে তাকিয়ে থাকলে ধূসর-খয়েরি রঙা, বুনো খরগোশের মতন চেহারার প্রাণীর দেখা মিলবে। জাঁসকারের উচ্চতম উপত্যকা অঞ্চলের এই প্রাণীদের মারমেট বলা হয়। পুবদিকে তিব্বত আর পশ্চিমদিকে জাঁসকার উপত্যকা - মধ্যিখানে রূপসু উপত্যকায় সো-মোরিরি। সবুজ-নীল রঙা হ্রদ, ওপারে চাংসের কাংড়ি আর লুংসের কাংড়ির বরফচূড়া। সো-মোরিরি হিমহাওয়ার রাজ্যপাট।

নীল অতলে আলোকচিত্রী - সুপ্রতিম ঘোষ

আসলে আদিম, শীতল মরুময় এই পাহাড় অঞ্চল, উপত্যকার প্রান্তে ইচ্ছেমতন ঘুরে বেড়ানো যায়। আবার যায়ও না। সুন্দরী, রূপসী, পাহাড়িয়া প্রকৃতি এখানে টানে - চরৈবতির আকর্ষণ যাঁরা কোনও মতেই এড়াতে পারবেন না, তাঁরাই পৌঁছোবেন এই প্রান্তীয় হিমশীতলের কোলে। জোরে হাওয়া বইলে শ্বাসের বড় কষ্ট। অক্সিজেনের অভাব। ক্ষণে ক্ষণে রক্তে অক্সিজেন মাত্রা কমে। ভালো থাকার দাওয়াই একটু একটু জলপান। এমনই কিছু তথ্য, কয়েকটা গল্পের প্লট আর অবাধ প্রকৃতির টানে সো-মোরিরি-তে পৌঁছেছিলাম জুলাই মাসের শেষে।

তারপর দুটো দিন দুটো রাতের মুগ্ধ হওয়ার রঙিন বৃত্তান্ত। একটা মেটে মনাস্ট্রি - প্রাচীন কোরজোক। দোতলায় উঠে আধো অন্ধকারে অনুপম বুদ্ধমূর্তি। বাইরে গ্রাম রাস্তায় প্রেয়ার হুইল ঘোরায় শহর ফিরতি মানুষ। সিনেমায় দেখা রঙের বদলে সো-মোরিরির রংবাসর আরো উজ্জ্বল, অনেক অনেক জীবন্ত। প্রাণ চঞ্চল চাংপা মেয়ের মধ্যে সো-মোরিরি নামের মেয়েটাকে খুঁজেই পেলাম না। সে বোধহয় আমারই ভুল। বরং সে রূপকথায় হারিয়েই থাকুক পরীরানির মতন। আপনি খুঁজবেন তাকে আনমনে অন্যমনে। আমি খুঁজবো অন্য ছুটিবন্ধুকে লেখায়, ছবিতে - লাদাখি গল্পের ছবিঘরের বাইরে।

www.amaderchhuti.com

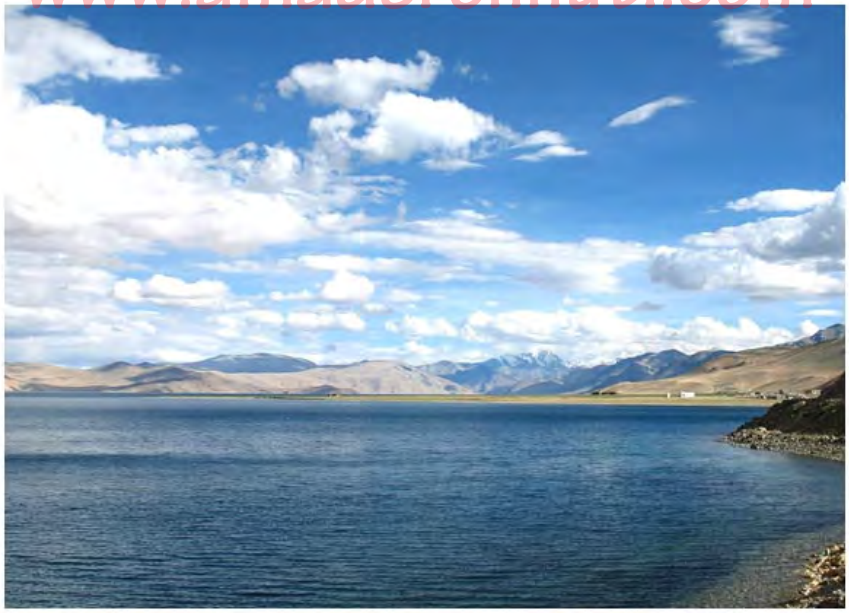

সোমোরিরি আলোকচিত্রী - অমলেন্দু রায়বর্মন

~ তথ্য- লাদাখ ~ সোমোরিরি ~ || ~ সো-মোরিরির ছবি ~ লাদাখের ছবি ~

বর্তমানে ট্রাভেল ছুটি পত্রিকার সম্পাদক ও ট্রাভেল ছুটি ভ্রমণ সংস্থার কর্ণধার সুপ্রতিম তাঁর দীর্ঘ সাংবাদিকতার জীবনে যুক্ত থেকেছেন ভ্রমণ, সানন্দা, বর্তমান সহ বিভিন্ন পত্রপত্রিকা ও সংবাদ চ্যানেলের সঙ্গে।

অচেনা উটি

সুমিত চক্রবর্তী

~ উটির তথ্য ~ || ~ নীলগিরির হ্রদের ছবি ~

সেপ্টেম্বরের ৩ তারিখে যখন চেন্নাই থেকে রওনা দিলাম তখন ম্যাপটা দেখতে দেখতে আমার মাথায় স্রেফ একটা কথাই ঘুরছিল যে কীভাবে এক যাত্রাতেই নীলগিরির উঁচু থেকে নীচুতে ছড়িয়ে থাকা আটটা হ্রদকে দেখে ফেলা যায়। এই আটটা হ্রদ হল আপার ভবানী, পশ্চিম হ্রদ ১,২,৩, পোর্তিমুন্ড, অ্যাভেলাঞ্চ, এমেরাল্ড আর পারসন ভ্যালি।

দুরন্ত এক্সপ্রেসে চেন্নাই থেকে কোয়েম্বাটোর পৌঁছালাম বেশ আরামেই -জিভে জল আনা রকমারি ভাজাভুজি খেতেখেতে। কোয়েম্বাটোর স্টেশনে আমাদের ড্রাইভার মি. কুমার অপেক্ষা করছিলেন -মুখে চেনা হাসি, এইভেবে যে আরেকদল ট্যুরিস্ট এল, এদের নিয়ে উটি যেতে হবে। আমিও মুচকি হেসে তাকালাম। মনে মনে বললাম -'বাছাধন, অনেক লম্বা রাস্তা পাড়ি দিতে হবে তোমায়'।

আমার স্ত্রী অবশ্য আমায় যতদূর চিনেছে, জানতোই যে এই বান্দা শুধু শুধু উটি যাবেনা, যদিনা কোন উদ্ভট জায়গার খোঁজ পেয়ে থাকে। যাইহোক, প্রাথমিকভাবে উটি যাওয়াই স্থির হল। হোটেল অলকাপুরীতে উঠলাম। তুলতুলে নরম কুলচা আর ধোঁয়া ওঠা ডাল ফ্রাই দিয়ে ভুরিভোজটা ভালোই হল। বাইরে তখন কনকনে ঠাণ্ডা আর মুষলধারে বৃষ্টি।

৪ তারিখ সকাল থেকেই মেঘলা। হোটেল ম্যানেজারও দেখলাম খুব একটা কিছু জানেননা হ্রদগুলোর ব্যাপারে। পরিষ্কার বলেই দিলেন বনদপ্তরের অনুমতি না নিয়ে যাওয়া অসম্ভব। দুগ্‌গা দুগ্‌গা করতে করতেতো রওনা দিলাম। উটি থেকে আপার ভবানী ৬০ কিলোমিটার। পরিষ্কার পিচের রাস্তার গায়ে চাবাগানের সবুজ ক্যানভাস। কয়েকটা বাঁক ঘুরে আমরা পাহাড়ের ওপরে পৌঁছালাম। দৃশ্য বদলে গেছে, চারপাশে এখন কুয়াশাঘেরা ঘন জঙ্গল।

আপার ভবানীর পথে আলোকচিত্রী - সুমিত চক্রবর্তী

রাস্তাটা এবারে হঠাৎ করেই বেশ এবড়োখেবড়ো হয়ে গেছে। কুয়াশার আঁধারে গাড়ি চালানোও বেশ শক্ত হয়ে যাচ্ছে। আমিতো ক্রমাগত চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি টুকু (আমার স্ত্রী) আর কুমারের (গাড়িচালক) আত্মবিশ্বাস চাঙ্গা রাখার জন্য। আমার নিজেরও অবশ্য গন্তব্য সম্বন্ধে খুব স্পষ্ট কিছু ধারণা নেই। আবহাওয়া মিনিট দশেক অন্তর অন্তরই খারাপতর হচ্ছে, চারপাশের কালোটা আরও গাঢ় হয়ে আসছে। কয়েকটা বুনো ঝরনা পড়ল পথে, আমাদেরতো মনে হল জলপ্রপাত। বেলা ১১টা বাজে মোটে, এখনই রাস্তা ঘন কুয়াশায় মোড়া। কোনমতে এগিয়ে যচ্ছিলাম। স্থানীয় কয়েকটা ছেলের সঙ্গে দেখা হল -তারাও আপার ভবানী সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলতে পারল না। এপথে আমরাই একমাত্র যাত্রী।

ঘন্টা কয়েক দুর্ধর্ষ সব বাঁক পেরিয়ে শেষ অবধি পৌঁছালাম আপার ভবানী বাঁধে। আমরা দুজনেই মন্ত্রমুগ্ধের মত তাকিয়ে আছি। কুমারের মুখ দিয়েও বেরিয়ে এল একটাই শব্দ 'নাল্লা' (তামিলে যার অর্থ অসাধারণ)। স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিলাম, পাতলা ধোঁয়ার মত কুয়াশা ধীরে ধীরে উপরে উঠছে আর তার থেকে জলবিন্দু ঝরে পড়ছে লেকের নীল জলে। কুয়াশার মায়া চাদর সরিয়ে নিজেকে যেন মেলে ধরছে নীলসায়র। সত্যিই অপূর্ব! আমার তো ভাবতেই অবাক লাগে যে কেন লোকে এত টাকা পয়সা-সময় খরচ করে বিদেশে বেড়াতে যায়! এদেশে কিছুরই অভাব নেই বন্ধু -শুধু দেখার চোখ মেলতে হবে। মনে পড়ল, যখন এখানে আসার পরিকল্পনা করছিলাম, আমার প্রতিবেশী বলেছিলেন, 'সুমিত, ওয়েস্টার্ন ক্যাচমেন্ট, পোর্তিমুন্ড আর আপার ভবানী মিস কোরোনা কিন্তু'। মনে মনে তাঁকে ধন্যবাদ দিলাম। কিছুক্ষণ সত্যিই নির্বাক হয়েছিলাম। টুকু আমার দিকে তাকিয়ে হাসছিল। ওর এই ভঙ্গী আমার চেনা। আমি সর্বস্ব বাজী ধরতে পারি যে ও অসম্ভব খুশি হয়েছে।

আপার ভবানী হ্রদ আলোকচিত্রী - সুমিত চক্রবর্তী

খানিকক্ষণের জন্য জগৎটা বদলে গেছে জল, কুয়াশা আর সবুজে। চারপাশে যাকিছুই দেখছি সবই যেন কুয়াশার মায়াজালে ঘেরা। তামিলনাড়ুর ইলেকট্রিসিটি বোর্ডের কয়েকজনের সঙ্গে দেখা হল। তারাও অবাক এই কয়াশার মধ্যেও ট্যুরিস্ট এসেছে দেখে। পারস্পরিক কুশল বিনিময় হতে ক্যামেরার কথা হঠাৎ খেয়াল পড়ল আমার। এদিকে পুরো এলাকাটাই কিন্তু কঠোর নিয়ন্ত্রণের আওতায় পড়ে, ছবি তোলা একেবারেই বারণ, ধরা পড়লেই শাস্তি। কিন্তু সরকার ও TNEB-র প্রতি সম্পূর্ণ শ্রদ্ধাশীল হয়েও নিয়ম ভেঙ্গে দু-একটা ছবি না তুলে পারলাম না। TNEB-র কর্মীরা প্রতিশ্রুতি দিলেন পরের বার এলে ওঁদের ইনস্পেকশন বাংলোয় রাত কাটানোর ব্যবস্থা করে দেবেন। একেবারেই ইচ্ছে করছে না, তবু ফিরতেতো হবেই। দুচোখ ভরে শেষ বারের মত দেখে নিলাম আপার ভবানীর অপার সৌন্দর্য। তারপর একইপথে ফিরে এলাম উটি। চেনা রাস্তায় সময় সবসময়ই কম লাগে তাইনা? আমাদেরও ঠিক তাই হল মাত্র কয়েক ঘন্টাতেই পৌঁছে গেলাম উটির জমজমাটে।

পাঁচ তারিখ তিন আর চারের মাঝামাঝি। সূর্য লুকোচুরি খেলছে মেঘের ফাঁকে। তাড়াতাড়িই রওনা দিলাম অ্যাভালাঞ্চ আর এমেরাল্ডের উদ্দেশ্যে। আমি বেশ নিশ্চিতই ছিলাম যে এক যাত্রাতেই এই দু'জায়গা ঘুরে নেওয়া যাবে। কুমারও আমাদের পছন্দ-অপছন্দ বুঝে গেছে। কোথাও কোনো ভালো দৃশ্যের সম্ভাবনা থাকলেই ওর 'সাদা ঘোড়া' ট্যাভেরা-কে দাঁড় করিয়ে দিচ্ছে। উটি থেকে অ্যাভেলাঞ্চের দূরত্ব মোটামুটি ২০ কিলোমিটার -পিচের রাস্তা। পৌঁছাতে কোনো অসুবিধেই হলনা। সরু একটা সেতু দিয়ে হ্রদ দুটো জুড়ে রয়েছে। গাড়ি থেকে নেমে অ্যাভেলাঞ্চের তীরে দাঁড়ালাম-অসাধারণ! স্ফটিক নীল স্বচ্ছ জলের ভেতর দিয়ে বহুদূর অবধি দেখা যাচ্ছে। টুকুতো আনন্দে আত্মহারা। ওর হাসিতে সারামুখে ছড়িয়ে পড়ছে সেই খুশির আলো। ব্রীজ পেরিয়ে ওপারে এমেরাল্ড দেখা হল। সবুজে ঘেরা এমেরাল্ডের পান্নাসবুজ জলের দিকে তাকিয়ে মনে হল সত্যিই এর নামকরণ সার্থক।

পরিকল্পনা মতো ৫ তারিখ বেলার দিকে রওনা দিলাম মুদুমালাই আর ওয়েনাডের উদ্দেশ্যে -সেখান থেকে গন্তব্য কোচি। মুদুমালাই আর ওয়েনাডে -দুজায়গাতেই দেখি ঝাঁকে ঝাঁকে ট্যুরিস্ট কেরালা যাচ্ছে -ওনামে যোগ দেওয়ার জন্য। প্ল্যান বদলে উটিতে ফিরে যাওয়াই মনস্থ করলাম। টুকুর মুখ বেজার। বেচারির দীর্ঘদিনের শখ কোচি আর মুন্নারে ওই আমার গাইড হবে। পথে সূচিপাড়া জলপ্রপাত দেখে ওর মুখে হাল্কা একটা খুশির আভা এলেও বেশ বুঝতে পারছিলাম যে মেঘ এখনো কাটেনি। আটই উটিতে পৌঁছে আবার হোটেল অলকাপুরীর সেই চেনা ঘর। আমার যদিও মনে মনে একটু আশা জেগেছে যে, পোর্তিমুন্ড ও পারসনভ্যালি এ যাত্রায় তাহলে বাকী থাকছে না। তবে এ নিয়ে কিছু না বলাই শ্রেয় মনে হল।

www.amaderchhuti.com

নয় তারিখ সকাল থেকেই মেঘলা -মাঝে মাঝে দু-এক ফোঁটা বৃষ্টি। কুমার যখন জিজ্ঞাসা করল আজকের প্ল্যান কি, কিছু না ভেবেই বলে বসলাম - পোর্তিমুন্ড আর পারসনভ্যালি। টুকু ভুরু কুঁচকে তাকাল, দৃষ্টিতে প্রশ্ন -'কোথায় সেগুলো জানো আদৌ কিছু?' আমিও তাকালাম ওর দিকে, ভাবটা এই -'এতবছর ধরে যেমন বিশ্বাস করছ, তেমনি বিশ্বাস রাখ'। কুমার বারবার প্রশ্ন করছে -রাস্তা কেমন, কোন পথে যাবে -এই সব। আমি উত্তর দিলাম,'অ্যাভেলাঞ্চের মতোই'। ঘন্টাখানেকের কিছু বেশি সময় লাগল পারসনভ্যালির ফরেস্ট চেকপোস্ট পোর্তিমুন্ডে পৌঁছাতে। শুরুতেই ব্যাপারটায় মাথা গলালেন উপস্থিত বনবিভাগের আধিকারিকটি। আমাদের কাছে লেক যাওয়ার পারমিট নেই জেনে অবিলম্বে ফেরত যেতে বললেন। কুমারও বিশেষ সুবিধা করতে পারল না। অতএব শেষ পর্যন্ত আমাকেই মঞ্চে নামতে হল। এসবক্ষেত্রে যা করতে হয় আর কি, এতবছর দরকারে যা করে আসছি -একটা সমঝোতার চেষ্টা। টুকুতো গজগজ করেই চলেছে - আমি অবশ্য সেসব গায়েই মাখছিনা। আধিকারিক ভদ্রলোকটিতো (নাম প্রকাশ করছি না স্বাভাবিক কারণেই) কিছুতেই মানবেন না, আর আমিও নাছোড়বান্দা। শেষে তুরুপের তাস প্রয়োগ করলাম -ওঁকেই বললাম রক্ষক হিসেবে আমাদের সঙ্গী হতে। শেষ অবধি বরফ গলল -উনি রাজি হলেন। যখন রক্ষক নিজেই পথপ্রদর্শক, তখন আর আমাদের পায় কে! ভদ্রলোক সামনের সিটে বসলেন, কুমার অ্যাক্সিলেটরে চাপ দিল। ওনার প্রথম বাক্যেই অবশ্য আমরা একেবারে কুপোকাৎ। 'কোনমতেই গাড়ি থামাবেন না, বা নীচে নামার চেষ্টা করবেন না। শেষ গণনা অনুযায়ী এখানে ৩৬টা বাঘ আছে'। কুমারতো সঙ্গে সঙ্গেই ওর পাশের জানলার কাচ তুলে দিল। টুকুর মুখে মুচকি হাসি-'কিহে কিরকম বুঝছ?' আমি মনে মনে ভাবছিলাম যদি একটাও দেখতে পাই আর ছবি তুলতে পারি! আধিকারিক ভদ্রলোক যেতে যেতেই এই বনের কোর এরিয়ার মধ্যের জায়গাগুলোর বর্ণনা দিচ্ছিলেন। ওঁর বিচিত্র সব অভিজ্ঞতার কথা শুনছিলাম আমরা। কয়েকটা সম্বর, বার্কিং ডিয়ার চোখে পড়ল। বুনো মোষের একটা দলও দেখতে পেলাম আর একজোড়া নীলগিরি ব্ল্যাক মাঙ্কি (লাঙ্গুর)। পথের হাল সঙ্গীন, বরং রাস্তা বলেই কিছু নেই এটাই বলা ভালো। কুমার যথাসাধ্য চেষ্টা করে যাচ্ছিল যতটা কম ঝাঁকুনি হয় তার জন্য। অনেক সময়ই বনরক্ষী ভদ্রলোকটি তাঁর সঙ্গীদের (আরও দুজনকে গাড়িতে তুলে নিয়েছিলেন উনি) নিয়ে গাছের ডালপালা সরিয়ে গাড়ি যাওয়ার জন্য রাস্তা সাফ করছিলেন। কয়েকটা পাগ মার্ক চোখে পড়লো আর তারপরই দেখতে পেলাম একটা বুনো মোষের অর্ধভুক্ত দেহাবশেষ। বনরক্ষীদের মতে একেবারে টাটকা -ঘন্টা দুয়েকও হয়নি এখনো। ওই দৃশ্য দেখে কুমারতো দরদর করে ঘামছে -এ জায়গায় ও আগে তো কখনো আসেই নি-এমন অভিজ্ঞতাও জীবনে প্রথম। আরও ঘন্টা দুয়েক ঝাঁকুনি খেতে খেতে আর ঘামতে ঘামতে পৌঁছালাম পোর্তিমুন্ড ভ্যালি। বাকীগুলোর মতো এটাও অসাধারণ। কোনটা যে বেশি সুন্দর তা বলা মুস্কিল। প্রত্যেকটা হ্রদেরই তার চারপাশের বন্যতা নিয়ে একটা নিজস্ব অনন্য সৌন্দর্য আছে। যার জন্য একটার সঙ্গে অন্যটার তুলনা করার কোন মানেই হয় না।

লেক এমেরাল্ড আলোকচিত্রী - সুমিত চক্রবর্তী

বনপথে আলোকচিত্রী - সুমিত চক্রবর্তী

গাড়িটা দাঁড় করিয়ে আধমাইল হেঁটে পৌঁছালাম পোর্তিমুন্ড হ্রদের তীরে। কুমারও এবার গাড়ি থেকে নেমে আমাদের সাথে সাথে এল। একা গাড়িতে থাকতে সাহস হচ্ছিল না ওর। আমাদের আর কিছুই খেয়াল ছিল না, সুন্দরের মধ্যে হারিয়ে ফেলেছিলাম নিজেদের। কেউ একজন ফিসফিসিয়ে বলল, 'থ্যাঙ্ক য়ু' -আমি জানি সে কে। অন্ধকার নেমে আসছিল, পারসন ভ্যালির হ্রদের দিকে গাড়ি এগিয়ে চলল। পূর্বপাড়ে সবে পৌঁছেছি, আমাদের বনরক্ষী বন্ধু চাপা স্বরে বললেন, 'ওপারে বাঘ'। শিরদাঁড়া দিয়ে যেন একটা কনকনে ঠান্ডা স্রোত বয়ে গেল। ওপারটা প্রায় ৫০০-৬০০ফুট দূরে। আমি নিশ্চিত -ওপারে যে পশুটাকে দেখেছি তার গায়ে হলুদ ছোপছোপ। প্রাথমিকভাবে বাঘের কথাই মাথায় আসে -কিন্তু আঁধার কুয়াশায় এত দূর থেকে দেখে আমি এখনো দোলাচলে ওটা সত্যিই বাঘ ছিল কিনা। আমার ১০০০ মিটার রেঞ্জের বুশনেল বাইনোকুলারে আকার যা বুঝলাম, প্রাণীটা একটা শিশু - পূর্ণবয়স্ক নয়। নিকন ক্যামেরার সাধারণ জুম লেন্সে অতদূর থেকে কোনো ছবি তোলা কিছুতেই সম্ভব হল না। হয়তো আমায় ও একটা ছবি তোলার সুযোগ দিয়েছিল, আমি সেটা হারালাম।

(অনুবাদঃ রত্নদীপ দাশগুপ্ত)

www.amaderchhuti.com

কুয়াশায় মোড়া হ্রদ আলোকচিত্রী - সুমিত চক্রবর্তী

~ উটির তথ্য ~ || ~ নীলগিরির হ্রদের ছবি ~

চেন্নাইতে তথ্যপ্রযুক্তি সংস্থায় সিস্টেম অ্যাডমিনিস্ট্রেটর সুমিত সুযোগ পেলেই বেড়িয়ে পড়েন অফবিট জায়গায় রোমাঞ্চের খোঁজে।

Rate This : - select -
Total Votes : 2
Average : 3.00

Like 4 people like this.

tell a Friend

স্বপ্নের দেশে একদিন

মহুয়া বন্দ্যোপাধ্যায়

তথ্য- প্যারিস ~ || ছবি ডিজনিল্যাণ্ড ~ প্যারিস ~

মাঝে মাঝে খুব ছেলেবেলায় ফিরতে ইচ্ছে করে - সেই মজার দিনগুলোতে। তখন অবশ্য আমার ছেলের ছোটবেলার মতো এত কার্টুন চ্যানেল, কম্পিউটার গেমস ছিল না। কিন্তু মিকি-মিনি অথবা সেই চিরকালীন স্নো হোয়াইট-সিন্ডারেলা তো আমাদের ছেলেবেলাও ভরিয়ে রেখেছিল - গ্রীষ্মের সেইসব একলা দুপুর, পুজো আর শীতের ছুটির সকাল-বিকেল।

এইসব ভাবতে ভাবতেই দেখি স্মৃতির দুয়ার খুলে কখন পৌঁছে গেছি প্যারিসের ডিজনিল্যান্ডে। লম্বা লাইনে দাঁড়িয়ে মাল্টিপল রাইডসের টিকিট কেটে একেবারে সোজা 'সুইস ফ্যামিলি রবিনসনের' সেই বিখ্যাত 'ট্রি হাউসে'র সামনে। কে না জানে, যোহান ডেভিড ওয়াইজ-এর লেখা বিখ্যাত এই উপন্যাসের কথা। কল্পনার সেই ছবির আদলেই তৈরি ডিজনিল্যান্ডের এই ট্রি হাউসটি। ট্রি হাউসের কাছে পৌঁছাতে গেলে পেরোতে হবে দড়ি দিয়ে বোনা কাঠের ছোট একটি ঝুলন্ত ব্রিজ। তলায় অথৈ জল। ব্রিজ পেরোব কী! দেখি আমি এপারে এগোতে না এগোতেই শুভ্রাংশু পৌঁছে গেছে ওমাথায়। শুধু তাই নয় বেশ কয়েকটা বাচ্চা ছেলের সঙ্গে সমানে তাল মিলিয়ে লাফাচ্ছে ব্রিজের ওপর। বোঝো কাণ্ড! যত বলি, থামো থামো, তত দেখি উৎসাহ বাড়ছে! বুঝলাম শুধু আমার নয়, এখানে এসে বয়সটা ওরও কমছে, হয়তো একটু বেশিই!

ঝুলন্ত ব্রিজ পেরিয়ে ট্রি হাউসে পৌঁছে দেখি সেটা প্রায় ছোটখাটো একটা দুর্গের মতো। বাড়ির মধ্যে ঢোকার আগে পেরিয়ে আসতে হবে অস্ত্রাগার -যেখানে সাজানো আছে বিভিন্ন অস্ত্রশস্ত্র -কামান, বন্দুক ও গোলাগুলি, কাল্পনিক শত্রুদের মোকাবিলা করার জন্য। বড় গাছটা দেখতে খানিকটা বটগাছের মতো হলেও আসলে কৃত্রিম - প্লাস্টিকের, তবে প্রায় বোঝাই যায় না। বাড়িটা সুন্দর করে গোছানো। বসার ঘরটা দেখলে মনে হয় যেন এখুনি রবিনসনদের কেউ একটা বই টেনে নিয়ে পড়তে বসবেন। রান্নাঘরে রয়েছে বাসনপত্তর, খাবার ঘরে কাঠের ডাইনিং টেবিল আর শোবার ঘরে একটা মাচা -সবই গাছের ওপর। সময় যেহেতু অল্প তাই কিছুক্ষণ থেকে হাঁটা দিলাম 'ফ্যান্টম ম্যানর হাউসে'র দিকে। সমগ্র ডিজনিল্যান্ডটি প্রায় ৪,৮০০ একর জমির ওপর তৈরি। ইচ্ছে হলে টয় ট্রেনে চেপে বিভিন্ন স্টেশনে নেমে যাওয়া যায়। তবে পায়ে পায়ে ঘোরার মজাই আলাদা। অক্টোবর মাসের সকালে হাল্কা রোদের আমেজ গায়ে মেখে হাঁটতে বেশ ভালোই লাগছিল।

www.amaderchhuti.com

প্যারিসের ডিজনিল্যান্ড আলোকচিত্রী – শুভ্রাংশু বিশ্বাস

'ফ্যান্টম ম্যানর হাউসে' ঢুকে মনে হল যে ভূতে বিশ্বাস করেনা সেও ভয় পেয়ে যাবে। নিশ্ছিদ্র অন্ধকারে কখনো নরকঙ্কালের লাল রঙের চোখ জ্বলে উঠছে কখনোবা কোন "ঘোস্ট" বিকট স্বরে অট্টহাস্য করছে। বললে বিশ্বাস করবেন না একবার তো আমার ঘাড়ের ওপর একটা ভূত নিঃশ্বাস ফেলল বেশ জোরে জোরেই। দু-এক মূহুর্তের জন্য আমার হৃৎপিন্ডটাই বোধহয় প্রায় বন্ধ হয়ে গিয়েছিল! এক ঘর থেকে আরেক ঘর যাওয়ার পর আমাদের উঠতে হল নৌকায় -অন্ধকার সুড়ঙ্গ, সরু জলপথের আশে-পাশে অসংখ্য ভূত-প্রেত। কেউ কাঁদছে আবার কেউ হাসছে। যতই বানানো হোক না কেন সত্যি বলতে কী প্রথমে খুব মজা লাগলেও শেষের দিকে আমি যে একেবারে ভয় পাইনি তা বললে মিথ্যে কথা বলা হবে। একটা কফিন থেকে যখন একটা গলিত শব উঠে পড়ল তখনতো আমার হাত-পা একবারে ঠান্ডা। দু-একটা বাচ্চা ভয়ে কেঁদে উঠল। নিজেকে অবশ্য ঠিক ওদের দলে ফেলছিনা।

পুরো ডিজনিল্যান্ডটা ঘুরতে হলে সবচেয়ে ভালো একটা ম্যাপ সংগ্রহ করে নেওয়া। প্রথমে ঢুকেই মেন গেটের ডান পাশে বড় করে আঁকা ডিজনিল্যান্ডের মানচিত্র রয়েছে। এছাড়া বেশ কিছু স্টলেও ডিজনিল্যান্ডের মানচিত্র পাওয়া যাচ্ছিল। আমি একটা মানচিত্র হাতে নিয়ে দেখলাম পুরো এলাকাটা চার ভাগে বিভক্ত -ডিসকভারিল্যান্ড, ফ্রনটিয়ারল্যান্ড, অ্যাডভেঞ্চারল্যান্ড এবং ফ্যানটাসিল্যান্ড। ফ্যানটাসিল্যান্ডেই রয়েছে স্লিপিং বিউটির প্রাসাদ। বিশাল প্রাসাদ -মানিকরত্নখচিত। গল্পের মতই প্রাসাদের মধ্যের সব চরিত্রগুলো গভীর ঘুমে অচৈতন্য। একটা অদ্ভুত নিস্তব্ধতা চারপাশে। যেহেতু আরও অনেক রাইড দেখা বাকী আর অগুণতি মানুষের ভিড় তাই আমরা স্লিপিং বিউটি ক্যাসেল থেকে বেরিয়ে তাড়াতাড়ি এগোলাম টয় ট্রেনে চড়বার জন্য। পিছনে পড়ে রইল ঘুমন্ত সুন্দরী তার রাজপুত্রের অপেক্ষায়। সময় বাঁচানো আর মজা ছাড়াও টয় ট্রেনে চড়বার আরেকটা বড় কারণ হল আমরা ততক্ষণে বুঝে গেছি গোটা ডিজনিল্যান্ড কেবলমাত্র পায়ে হেঁটে ঘোরা বেশ কষ্টকর! তবে যাঁরা হাঁটতে একেবারেই অক্ষম তাঁদের মন খারাপ করার কোন কারণ নেই। হুইলচেয়ারে বসে তাঁরা অনায়াসেই পুরো ডিজনিল্যান্ড ঘুরে দেখতে পারবেন।

টয়ট্রেনে উঠতে গিয়ে দেখি সেখানেও প্রচুর ঠেলাঠেলি -লম্বা লাইন। একজন ফরাসি মহিলা তো আমাকে প্রায় ধাক্কে উঠলেন - "পুসে ন্য পাসা, মাদাম"। ভাগ্যিস ফরাসি একটু-আধটু জানা ছিল তাই বুঝতে পারলাম ঠেলতে বারণ করছেন। মোটেও ঠেলিনি তবু বাদামি চামড়ার মানুষ বলেই হয়তো দোষ হল আমার। যাইহোক কোনরকমে টয়ট্রেনের কামরায় একটা জানালার ধারে বসে পড়লাম। কলকাতার নিক্কো পার্কের টয়ট্রেনটি এর কাছে সত্যিই খেলনা। এই ট্রেনে বিশাল বড় বড় কামরা -সংখ্যায় অনেক বেশি আর যাচ্ছেও বেশ জোরেই। মাঝে মাঝে বাঁশি বাজছে। বেশ কিছুটা পথ টয়ট্রেনে করে যাবার পর একটা স্টেশনে টুক্ করে নেমে পড়লাম। নেমে একেবারে পড়বিতো পড় শয়তানের আবির্ভাবের প্যারেডের সামনে। অন্যান্য ট্যুরিস্টদের কাছ থেকে জানতে পারলাম যে ডিজনিল্যান্ডে রোজ এক-একটা প্যারেডের আয়োজন করা হয় আর সেগুলি বেশ চিত্তাকর্ষকও। আমাদের ভাগ্যে শয়তান! কী আর করা যাবে, অতএব তারই রুদ্ধশ্বাস

শয়তানের প্যারেড আলোকচিত্রী – শুভ্রাংশু বিশ্বাস

প্রতীক্ষা।

শয়তানের আবির্ভাব বা 'ডেভিলস্ অ্যারাইভাল' দেখতে দুদিকে মানুষ সারিবদ্ধ হয়ে ক্যামেরা হাতে দাঁড়িয়ে আছে। কেউ কেউ ফুটপাথের ওপর বসেই পড়েছে। ঠিক কী ঘটবে তা নিয়ে বিস্তর জল্পনা কল্পনা চলছে। খুব জোরে জোরে ড্রাম বাজতে শুরু করল আর তারপরই দেখি ওই তো শয়তানের সাঙ্গপাঙ্গরা আসছে। বিকট কালো, সবুজ আর নীল মুখোশ পরে শয়তানের দলবল মার্চ করছে। ঠিক যেন শিবঠাকুরের নন্দী-ভৃঙ্গী -তবে এরা দলে আরও ভারি। কান ঝালাপালা করা তীব্র বাজনার সঙ্গে কিছুক্ষণ ধরে চলল উদ্দাম ভূতের নৃত্য! হাসতে হাসতে আমার পেটে খিল ধরে যাওয়ার যোগাড়।হঠাৎ বাজনা থেমে গেল। ভাবছি কি হল! ঠিক তখনই দুটি কালো ঘোড়া ছুটিয়ে একটা ঝাঁটা বাঁধা গাড়িতে শয়তানের আবির্ভাব ঘটল খোলা রঙ্গমঞ্চে। কালো ঘোড়া দুটোর আকার দেখে চমকে উঠলাম -আমাদের দেশের ঘোড়াগুলোতো এদের কাছে নেহাতই বাচ্চা! শয়তান বসে আছে ছ্যাকরা গাড়িতে কালো জামা গায়ে আর গাড়ির ওপরে কঙ্কালের মাথা আঁকা পতাকা উড়তে উড়তে সগৌরবে ঘোষণা করছে শয়তানের আগমনবার্তা। চোখের পলক ফেলতে না ফেলতে শয়তানের প্যারেড সঙ্গীসাথী সমেত উধাও হয়ে গেল প্রকান্ড একটা গেটের ভেতর। যাবার আগে শয়ে শয়ে ক্যামেরার উদ্দেশে পোজ্ দিয়ে শয়তান হাত নাড়তে লাগল।

আবার এগিয়ে চলা। রাইড্সগুলোর ফাঁকে ফাঁকে বিশাল এলাকা জুড়ে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে বিভিন্ন সুভ্যেনির শপ, রংবেরং-এর নানান ফুলগাছ আর কিছু অবাক করা মডেল। এক জায়গায় দেখি দাঁড়িয়ে আছে 'কুমড়োপটাশ' - আমাদের 'আবোল তাবোল'-এর নয় - এ হল সাহেব কুমড়োপটাশ -'মিঃ পিটার পাম্পকিন'। এঁর পরণে পশ্চিমি জামাকাপড় কিন্তু মাথায় একটা মস্ত বড় কমলা রঙের কুমড়ো। আমি পিটার পাম্পকিনের পাশে হাসিমুখে ছবি তুলে ফেললাম। আর শুভ্রাংশু মিসেস পলি পাম্পকিনের সঙ্গে। এরই মাঝে ঘুরতে ঘুরতে এক জায়গায় মিকি আর মিনির সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। ওরা দুজনে ইতস্ততঃ ঘুরে বেড়াচ্ছিল আর সকলকে অটোগ্রাফ দিচ্ছিল। আমিও এক ফাঁকে সুযোগ পেয়ে মিনির সঙ্গে হ্যান্ডশেক করে নিলাম। বিশাল চেহারা নিয়ে মিনি আমার কাঁধে তার হাতটা রাখল। এখন কলকাতার অনেক মেলাতেও চলমান কার্টুন ক্যারেকটারদের দেখতে পাওয়া যায় কিন্তু ডিজনিল্যান্ডে তাদের সঙ্গে দেখা হওয়ার থ্রিলটাই অন্য। ঠিক যেন ছেলেবেলার কমিক্সের পাতা থেকে উঠে এসে ওরা হাত মেলালো সেই ছোট্ট মেয়েটার সঙ্গে যে নাকি বায়না ধরত বাবা-মায়ের সঙ্গে ঝিলমিল যাবে বলে (নিক্কো পার্ক তখনো হয়নি)।

আমরা এক মঙ্গলবারে এসেছি ডিজনিল্যান্ডে, রবিবার বা অন্য কোন ছুটির দিনে এলে কোনও রাইডে ওঠাই দুষ্কর হত। প্রতিটি রাইডেই বিশাল সরীসৃপের মতো লাইনে দীর্ঘ প্রতীক্ষায় দাঁড়িয়ে পৃথিবীর বিভিন্ন কোণ থেকে আসা মানুষ। এরকমই একটা রাইডের জন্য অপেক্ষা করতে করতে মনে এল দুর্গাপুজোর মন্ডপে ঢোকার লাইনের কথা। এখানেও আছে 'ফাস্ট পাসের' ব্যবস্থা -কলকাতায় যেমন 'ভি.আই.পি.' পাস। 'ফাস্ট পাস' যার কাছে থাকবে তাকে আর কষ্ট করে লাইনে দাঁড়াতে হবে না। সে সরাসরি গিয়েই রাইডে চড়তে পারবে লাইনের দাঁড়ানোদের দিকে তাকিয়ে মুচকি হেসে। তবে 'ফাস্ট পাসে'-র আওতায় কেবল কিছু কিছু বিশেষ রাইডসই পড়ে। সব রাইডসে এভাবে বেলাইনে ওঠার সুযোগ পাওয়া যায় না!

www.amaderchhuti.com

দুপুরে 'ম্যাক ডোনাল্ডস্'-এ ঢুকলাম লাঞ্চ খেতে । এখানকার ম্যাক ডোনাল্ডস্টি ফ্রান্সের বৃহত্তম। এতবড় দোকানে প্রথমবার ঢুকলে চোখে ধাঁধা লেগে যায়। যে দিকে দু চোখ যায় শুধু সারি সারি চেয়ার আর টেবিল । দোকানের বাইরে ম্যাক ডোনাল্ডসের হলুদ-লাল জামা পরা জোকারের সেই চেনা মূর্তি। শিশুরা দোকানে ঢুকলেই তাদের একটা করে বেলুন দিয়ে অভ্যর্থনা জানানো হচ্ছে। আর ভিড়? সকাল থেকে হাঁটাহাঁটির পর ঘন্টাখানেক দাঁড়িয়ে পা যখন ব্যথায় অস্থির তখন হাতে পেলাম বার্গার আর কোল্ড ড্রিংকস্। পেটের মধ্যে ততক্ষণে দাউদাউ করে জ্বলতে শুরু করেছে ক্ষিদের আগুন। যাইহোক ভোজনপর্ব সেরে কিছুটা 'ক্যালোরি গেইন' করে আবার ছুটলাম পরের রাইডের দিকে।

'স্পেস স্টেশনে' পৌঁছে দেখি বেশ কিছু বাচ্চা ছেলের রাইডটা এত ভালো লেগেছে যে তারা আবার চড়বে বলে দৌড়াচ্ছে। এই রাইডে শারীরিকভাবে সক্ষম ব্যক্তি না হলে ওঠা কিন্তু একেবারে মানা। একদম রকেটের মত দেখতে রাইডটিতে প্রতিটি আসনের সঙ্গে আছে মজবুত আগল। রকেটের মধ্যে বসে হবে আমাদের মহাকাশ ভ্রমণ। আমি একটা আসনে বসে পড়তেই নিমেষের মধ্যে আগলটি আটকে গেল আমার পেটের কাছে -অনেকটা সিট বেল্টের মতো। তারপর যেন উল্কার গতিতে ছুটতে শুরু করল রকেটটা -কাল্পনিক নক্ষত্রলোকে। কখনো জ্বলজ্বলে তারাদের মাঝখান দিয়ে, কখনোবা ঘন কালো গ্যাসের মেঘের দলকে হটিয়ে, আবার কখনো এঁকেবেঁকে উল্কা পিন্ডদের পাশ কাটিয়ে। একে ভয়ঙ্কর গতির অনুভূতি, তারপর একসময়ে বসার জায়গাগুলো গেল ১৮০ ডিগ্রি ঘুরে -অর্থাৎ কিনা 'হেঁট মুন্ড উর্দ্ধপদ' অবস্থায় কয়েক মুহূর্ত ঝুলতে লাগলাম আমরা। প্রচন্ড কষ্টে আমার প্রায় চোখ দিয়ে জল আসবার উপক্রম হল। শুনতে পেলাম পাশে শুভ্রাংশু চেঁচাচ্ছে ওর চশমা খুলে ঝুলছে বলে। রকেটের গতি কিন্তু কমেনি। সবাই যখন প্রায় ভয়ে আধমরা তখন সমস্ত বিশ্বব্রহ্মান্ড ঘুরে, চাঁদের পাশ কাটিয়ে পৃথিবীতে ফিরে আসার সময় হল। রকেটের গহ্বর থেকে বেরোবার সময় ক্লোজ সার্কিট ক্যামেরাগুলো ঝলসে উঠল। নিজেদের ভীত সন্ত্রস্ত মুখগুলোর ছবি দেখে খুব একচোট হেসে নিলাম।

সারাদিন ধরে লাইনের পর লাইন দিয়ে একটার পর একটা রাইড চড়ে যখন প্রায় সন্ধে নেমে আসছে দৌড়ালাম সার দিয়ে সাজানো সুভ্যেনির শপগুলোর দিকে। ঠিক যেন রাসের মেলা। বিক্রি হচ্ছে হরেকরকমের খেলার জিনিস -মিকি মাউস, ডোনাল্ড ডাক, কাউবয় টুপি, বন্দুক, ঢাল-তরোয়াল, মিকি আঁকা টিশার্ট, সিন্ডারেলা কস্টিউম, বিভিন্ন রঙের ও আকারের পুতুল, মাথার শিং, মুখোশ, চকোলেট, ক্যান্ডি আরও কত কী -বলে শেষ করতে পারব না। তবে বেশীরভাগ জিনিসেরই আকাশছোঁয়া মূল্য। ঝোঁকের মাথায় আমি একটা ডিজনিল্যান্ডের প্যারেডের ভি.সি.ডি. কিনে ফেললাম। তার দামই পাঁচ পাউন্ড!

আমাদের ট্যুরিস্ট বাসের দিকে যখন হেঁটে ফিরছি মন খারাপ করা একটা সুর বাজছে মাইকে। সমস্ত ডিজনিল্যান্ড জুড়ে আলোর রোশনাই। ঘরে ফেরা মানুষের ঢল দেখতে দেখতে মনে হচ্ছিল যেন একটা মিনি বিশ্বের মানুষ টাইম মেশিনে চেপে কয়েক ঘন্টার জন্য শৈশবে

রাতের ডিজনিল্যান্ড আলোকচিত্রী – শুভ্রাংশু বিশ্বাস

ফিরে গিয়েছিল। এখন খেলা শেষে ধুলোবালি মেখে আবার বর্তমানে পৌঁছে ঘরে ফেরার পালা। মনে মনে ভাবছিলাম বাস্তবে যদি আর কখনো না পারি, স্লিপিং বিউটির মত ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে ঠিক একদিন আবার ফিরে আসব এই স্বপ্নের দেশে।

তথ্য- প্যারিস ~ || ছবি ডিজনিল্যাণ্ড ~ প্যারিস ~

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনামূলক সাহিত্য এবং ইংরেজি সাহিত্যের ছাত্রী মহুয়া বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় ছোট গল্প ও ভ্রমণকাহিনি লেখেন।

Rate This : - select -
Total Votes : 3
Average : 2.33

Like 4 people like this.

tell a Friend

Post Comments

www.amaderchhuti.com

To view this site correctly, please click here to download the Bangla Font and copy it to your c:\windows\Fonts directory.

For any queries/complaints, please contact admin@amaderchhuti.com
© 2011 - AmaderChhuti.com • Web Design: Madhuwanti Basu
Best viewed in FF or IE at a resolution of 1024x768 or higher

ছুটির আড্ডা

বেড়িয়ে এসে আপনার অভিজ্ঞতাগুলো যেমনভাবে শেয়ার করতে চান কাছের মানুষদের সাথে - ঠিক তেমনি করেই সেই কথাগুলো ছোট্ট করে লিখে পাঠিয়ে দিন ছুটির আড্ডায়। ছয় থেকে ছেষট্টি আমরা সবাই কিন্তু এই ছুটির আড্ডার বন্ধু। লেখা ডাকে বা নির্দিষ্ট ফর্মে মেল করে পাঠালেই চলবে। লেখা পাঠাতে কোনরকম অসুবিধা হলে ই-মেল করুন - amaderchhuti@gmail.com

বাংরিপোশির হাতছানি

সুদীপ্ত মজুমদার

~ তথ্য- বাংরিপোশি || বাংরিপোশির ছবি - সুদীপ্ত মজুমদার ~

বাংরিপোশি - শুধুমাত্র একটা রোমান্টিক নামের আকর্ষণে যখন উড়িষ্যার এই অখ্যাত জনপদ বেছে নিই সপ্তাহান্তিক ছুটি কাটানোর জন্য, তখন আমার সহযাত্রীদের অনেকেই প্রাথমিক দ্বিধা পোষণ করেছিলেন। এটা ঠিকই যে জায়গাটা সম্পর্কে খুব বেশি তথ্য জানা ছিল না। কোন এক ভ্রমণ পত্রিকায় পড়া একটি ছোট লেখাই সম্বল। কিন্তু নতুন জায়গায় যাওয়ার সেটাই তো মজা।

সকাল সাতটা পঁচিশের ফলকনামা এক্সপ্রেস যখন বালাসোর পৌঁছল তখন প্রায় বেলা এগারোটা। সেখান থেকে একটা গাড়ি ভাড়া করে রওনা হলাম আমাদের গন্তব্যের দিকে। পিচের রাস্তার দু-ধারের গাছগুলির নুইয়ে পরা শাখা যেন তোরণ সাজিয়ে আমাদের স্বাগতম জানাবার জন্যই দাঁড়িয়ে আছে। আগে থেকে বলা থাকায় হোটেলে আমাদের দুপুরের রান্না করে রেখেছিল না হলে বেশ মুশকিলেই পড়তাম। সামান্য সেই আয়োজনই ক্ষিদের মুখে যেন অমৃত।

বাংলো প্যাটার্নের একটা ছোট একতলা বাড়ি। তিনটে শোবার ঘর আর একটা ডাইনিং স্পেস -এই নিয়ে হোটেল। পিছনের দিকে কেয়ার-টেকার তাঁর পরিবার নিয়ে থাকেন। মেন গেট থেকে একটু হেঁটে গেলেই রাস্তা -NH6। সেই রাস্তা ধরে আমরা হাঁটতে বেরোলাম বিকেলবেলা। দু-পাশে খোলা মাঠ, ধান জমি আর ইতি উতি গাছ-গাছালির শান্তির পরিবেশ। নিস্তব্ধতাকে মাঝে মাঝে ভেঙ্গে দিচ্ছে হুশ্ করে চলে যাওয়া কোনো ট্রাক বা গাড়ি। কিছু দূরে একটা ধাবায় বসে যখন চায়ের তেষ্টা মেটাচ্ছি তখন তাকিয়ে দেখি সামনের ছোট পাহাড়ের পেছনে সূর্য অস্ত যাচ্ছে। গোধূলির বর্ণচ্ছটা পুকুরের জলে প্রতিফলিত হয়ে এক মায়াময় পরিবেশ সৃষ্টি করেছে।

যাওয়ার পথে আলোকচিত্রী - সুদীপ্ত মজুমদার

www.amaderchhuti.com

পরদিন সকালে আবার গাড়ি ভাড়া করে বেরিয়ে পড়লাম খড়কাই নদীর ওপর সুলাইপাত ড্যাম দেখতে। দুঘন্টার যাত্রার শেষের দিকটায় মেঠো পথে গ্রামের ভেতর দিয়ে যাওয়া। নদীর টলটলে নীল জল আর দূরের পাহাড় যেন নির্জনে হাতছানি দিয়ে ডাকে।

ফেরার পথে বুড়িবালাম নদীর পাশে পাশে চলা। বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে গরমও বাড়ছে লাফিয়ে লাফিয়ে। জানুয়ারি মাসেই এই রোদের তেজ হলে না জানি গ্রীষ্মকালে কি হয়! পথে ডোকরা শিল্পীদের গ্রামে খানিক বিরতি। অপূর্ব এই শিল্পকাজ কেমনভাবে হয় তাই প্রত্যক্ষ করা নিজের চোখে। এখানে প্রায় সব ঘরেই শিল্পীরা এই কাজ করেন। প্রথমে মাটির ওপর মোমের একটা আস্তরণ দিয়ে তাতে সূক্ষ্ম কাজ করা। তার ওপর আবার মাটি চাপিয়ে পুড়িয়ে নিয়ে ছাঁচ তৈরি হয়। সেই ছাঁচ, গলানো ব্রোঞ্জ দিয়ে ভর্তি করে পরে ঠান্ডা হলে ওপরের মাটি সরিয়ে নেওয়া হয়। ভাবতে অবাক লাগছিল আমরা শুধু সাজানো মূর্তিটাই দেখি, তার পিছনে যে কতখানি পরিশ্রম আছে তা এখানে না এলে জানতেও পারতাম না। এই বেড়ানোর স্মৃতি হিসেবে আমরা সকলেই কিছু কিছু মূর্তি কিনে নিলাম।

বাংরিপোশি আলোকচিত্রী - সুদীপ্ত মজুমদার

সন্ধের পর থেকেই আর কিছু করার নেই। টিভি নেই, ইলেকট্রিসিটি থাকলেও কম ভোলটেজের আলোয় বই পড়া যায় না। আর বিএসএনএল ছাড়া কোন মোবাইল টাওয়ারও ধরে না। তার মধ্যে আবার প্রায় রুটিন করে প্রতি সন্ধ্যায় লোডশেডিং হয় ঘন্টা দুয়েক। কিন্তু ঘরের বাইরে এসে আকাশের দিকে তাকিয়েই মনটা ভরে গেল। এত তারা তো কলকাতায় দেখতে পাই না কখনো এত স্পষ্ট করে! এমনকি সপ্তর্ষিমন্ডলও খুব সহজেই চিনতে পারলাম। মনে হচ্ছিল যেন তারারা লক্ষ আলোকবর্ষ পেরিয়ে আমাদের কত কাছাকাছি চলে এসেছে।

বাংরিপোশিতে সূর্যাস্ত আলোকচিত্রী - সুদীপ্ত মজুমদার

~ তথ্য- বাংরিপোশি ‖ বাংরিপোশির ছবি - সুদীপ্ত মজুমদার ~

নামী তথ্যপ্রযুক্তি সংস্থায় কর্মরত সুদীপ্ত ভালোবাসেন বেড়াতে।

Rate This : - select -
Total Votes : 2
Average : 2.50

Like 4 people like this.

tell a Friend

www.amaderchhuti.com

Post Comments

To view this site correctly, please click here to download the Bangla Font and copy it to your c:\windows\Fonts directory.

For any queries/complaints, please contact admin@amaderchhuti.com
© 2011 - AmaderChhuti.com • Web Design: Madhuwanti Basu
Best viewed in FF or IE at a resolution of 1024x768 or higher